আরেক কালান্তরে

আহমদ রফিক

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৮
আগস্ট : ১৯৭১

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ
আব্দুল বাসেত

AREK KALANTAREY : By Ahmad Rafique, Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh,

লোহা-লক্কড়ের ব্যাপ্ত কাঠিন্যেও
রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি যার মুগ্ধ
অনুরাগ অনুসন্ধিৎসু আবেগে
অফুরান্, সেই কর্মক্ষু বুদ্ধিজীবী
এম. আবদুল্লাহ সাহেবের
উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

শিল্প সংস্কৃতি জীবন (প্রবন্ধ)
নির্বাসিত নায়ক (কবিতা)
অনেক রঙের আকাশ (গল্প)
জীবন রহস্য (বিজ্ঞান-অনুবাদ)
অণুর দেশে মানুষ (ঐ)
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা (ঐ)
বাউল মাটিতে মন (কবিতা)

সাহিত্যের গণ-সচেতন ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চল্লিশ দশক থেকে যে বিতর্কের সূচনা, বিভিন্ন রূপে তার ধারা বর্তমান দশকেও বহমান ; যদিও এই বিতর্ক এক অর্থে তাঁর সৃষ্টির সমকালিক সজীবতার ইঙ্গিতবহ। তথাপি সাধারণভাবে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি রাজনীতি-সম্পৃক্ত বিষয়ে রৈবিক ভূমিকার বাস্তব পরিচয় তুলে ধরা—এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের পূর্ব-চৈতন্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-মানসের সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিশ্লেষণ ও তা'র ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রকৃতি নির্ধারণের প্রচেষ্টা বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এ কারণেই এদেশের মানুষের কাছে স্বল্প-পরিচিত প্রারম্ভিক রবীন্দ্রনাথ এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত।

গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশনার বিষয়ে যাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতার দায়ে আমি ঋণ-বদ্ধ, সেই অনুজ-প্রতিম ও বন্ধু-প্রতিম শুভানুধ্যায়ীদের নামোল্লেখ না করেই তাদের ঋণের স্বীকৃতি সমাপন করতে চেয়েছি। এ ছাড়া বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ-বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিক তৎপরতা ও সহযোগিতা কর্তব্যের বাধা-ধরা গণ্ডীর উর্ধ্বে বিষেশভাবে উল্লেখ্য, যার ফলে প্রকাশনার কাজ নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হয়েছে—এরা সবাই ধন্যবাদার্হ।

আহমদ রফিক

বিষয় সূচী

বিতর্কের আলোয় ১—৮
রাজনীতির জটিল উদ্যানে ৯—৪৪
কবি স্বভাব : শৈল্পিক সততায় ৪৫—৬৭
স্বদেশ ও সম্প্রদায় : উদার ভাষ্যে ৬৮—৯৪
মাটির ভুবন : গভীর মননে ৯৫—১১০
বিশ্ব চৈতন্যের ঘাটে ১১১—১৩৮
রবীন্দ্র-মানস : কালান্তরে ১৩৯—১৬২
মানুষের স্বপক্ষে : কালান্তরে ১৬৩—১৭৬

উৎকর্ষের দুরূহ ধাপগুলো তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে পরিশীলিত শক্তির পরিচয়ে। এবং সময় তাঁর পরিচর্যা করেনি একটানা ভক্তিবাদের চন্দন প্রলেপে। পর্যায়ক্রমে বিরোধী স্রোতের সংক্ষুব্ধ আবর্ত পেরিয়ে আসার চেষ্টায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম—এবং বিতর্কের বিশ্লেষী আলোক-বৃত্তে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছে বার বার। এমন কি সত্তরের দশকে পৌঁছেও আমরা তাঁকে বিচারের আয়োজন থেকে রেহাই দেইনি। শুধু একালেই নয়, তাঁর জীবদ্দশা থেকেই অর্থাৎ গত আট-নয় দশক ধরেই চলেছে এই জেহাদ। কখনো রক্ষণশীলতার ধূসর কক্ষ থেকে, কখনো অদূরদর্শী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সুউচ্চ মঞ্চ থেকে, কখনো বা নান্দনিক সাহিত্যের রাগী আধুনিকতার কণ্ঠ থেকে। অবশ্য চল্লিশ দশকে অতিবাম ভাবনা-চিন্তার তীব্রতা থেকেও শরসন্ধান চলেছে ('মার্কসবাদী'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেনের সমালোচনা-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), যার প্রভাব বড় একটা স্থায়িত্বের শক্তি অর্জন করতে পারেনি। ইদানিং রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচার নিয়ে অনুরূপ অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সমভাবে লক্ষণীয়। এমনো দেখা গেছে যে বুদ্ধদেব বসু কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বুদ্ধিদীপ্ত ও মননশীলতার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-ব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে নৈরাজ্যের ধারালো ছুরিতে। তবু একদিকে অত্যুগ্র ভক্তিরসের কাদা এবং অন্যদিকে বিচিত্র অভিযোগের ক্রুদ্ধ শরসন্ধানের মধ্যে রবীন্দ্র রচনার একটি সবিশেষ অংশ বার বার সময়ের সীমানা অতিক্রম করতে চেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এই চিত্তাকর্ষক তথ্যটিও হয়তো অবহেলার নয় যে শিল্প-স্রষ্টা এই ব্যক্তিত্বটিকে বিভিন্ন শিবির থেকে এমন বিচিত্র ও বৈপরিত্যময় বিশেষণে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে যা রবীন্দ্র-রচনার চরিত্র নির্ণয়ে প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করেছে মাত্র।

কিন্তু কেন এই বিরোধের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং গন্তব্যের এই অনিশ্চিত পরিণাম ? তবে কি একটি সত্যেই আমাদের প্রত্যয় স্থিত হবে যে সময়ের সুদীর্ঘ চত্বর পেরিয়ে আসা যে কোন শিল্প-সৃষ্টির বিতর্কিত সত্তা তার অস্তিত্বের সজীবতাই চিহ্নিত করে থাকে, তার মূল্যহীনতা বা অসারত্ব নয়। কারণ, রাজনৈতিক অবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার পর্যায়গত এবং গুণগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পূর্বতন শিল্প কর্ম সাধারণত বিতর্কের পরিধি সৃষ্টি না করে পারেনা ; বিশেষ করে সেসব রচনা যদি কোন সম্প্রদায়, জাতি শ্রেণী বা তাদের অন্তর্ধৃত সমস্যাবলীর প্রবহমানতা স্পর্শ বা প্রভাবিত করে থাকে। তাই কোন শিল্পী-মানস শুধু যে সমকালীন আয়ুর পরিধিতে তাৎক্ষণিকতা নিয়েই সজীব, তা নয় ; পরবর্তী কালের সমস্যাবলীতে বা তার ঐতিহ্যগত প্রশ্নেও তীক্ষ্ণ অস্তিত্ব নিয়ে জীবিত। হয়তো এ সব কারণেই প্রায় শত বৎসরেও রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব আমাদের বিতর্কের, আমাদের উত্তেজনার উৎস। তাঁকে আমরা নির্বিকার অবহেলায় একপাশে সরিয়ে রেখে পথ চলার নির্বাক নিশ্চিন্ত উপভোগ করতে পারছিনা। বরং বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র পরিচয়ের লেবেল এঁটে তাঁকে কোন না কোন শিবিরে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা চলেছে অবিরাম। তাই রবীন্দ্রনাথ কখনো কবি, ভাববাদী কবি বা ধনতন্ত্রের প্রতিভু ; কখনো প্রগতিবাদী বা কবি ; আবার কখনো বিশুদ্ধ শিল্পের ধারক, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতিভু কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল স্রষ্টা। কিন্তু একটি বাস্তব সত্য এইসব প্রচেষ্টায় অবহেলিত হয়েছে যে রবীন্দ্ররচনার ব্যাপক পরিসর একটি সংকীর্ণ পরিচয়ে চিহ্নিত হবার মতো নয় ; দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-জটিলতা, বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতায় রবীন্দ্র-মানস এমনি বৈচিত্র্যে আক্রান্ত যে সেখানে এক স্রোতের পরিচয়ে তার সার্বিক চরিত্র ও প্রকৃতি বিধৃত নয়। তাই অনেক সময় কবিতায় যাকে পাই চিঠিপত্রে তাকে দেখিনা ; উপন্যাসে যাকে চিনি, প্রবন্ধে তার সম্পূর্ণ ভিন্নতর রূপ ; আবার গানে অন্য এক চৈতন্যের পরিচয় পরিস্ফুট।

হয়তো তাই এতসব বৈপরিত্যময় চিহ্নিত-করণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-রচনার একটি সবিশেষ অংশ বিস্মৃতির বা অবহেলার বালুচরে চাপা পড়েনি। ব্যক্তিক বা সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষঙ্গে কিংবা বিবিধ কার্যকারণ প্রসঙ্গে ওরা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বা তাদের আমরা স্মরণে এনেছি। এ তথ্য যদি অনস্বীকার্য না হয়, তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে রবীন্দ্র-রচনায় এমন কোন কালজয়ী উপাদান উপস্থিত, যা তাকে বাঁচিয়ে রাখছে বিতর্কের, ক্রোধের কিংবা ঘৃণার জ্বলন্ত উনান থেকে, অথবা

উত্তীর্ণ করছে ভক্তিবাদের শীতল বিবর্ণ কবর থেকে? প্রশ্নটির উত্তর নিঃসন্দেহে জটিল, গবেষণা-সাপেক্ষ এবং গভীর বিশ্লেষণ-নির্ভর। প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যে চিরন্তনতার প্রশ্নটিও আমাদের ভাবনা-চিন্তা উদ্বেল করে তোলে, যা, আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও বিতর্কের উত্তাপ ছড়াতে থাকবে। বর্তমান যুগে প্রবেশ করে বিশুদ্ধ শিল্পকলার সমর্থকদের হয়তো স্বীকার করতে হচ্ছে যে তাৎক্ষণিকতার প্রয়োজনে সৃষ্ট শিল্পেও উৎকর্ষের উপাদান ও উত্তাপ কেন্দ্রীভূত হয়। এবং সমাজ-সচেতন শিল্পীর রচনাও যুগপৎ সমকালিক উপকরণে এবং সৃষ্টিগত উৎকর্ষে বিদ্ধ,—বাংলা সাহিত্যেই এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাবে। সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে শুধুমাত্র বিলাসের মাধ্যম বা অপ্রয়োজনের অলস উপকরণ নয় এই সব সৃষ্টি, বরং এরা সমাজ-সত্যের অন্তর্নিহিত রূপ—তার শক্তি বা অপশক্তির উপকরণগুলোকে ব্যক্তিক বা সমষ্টিগত অনুভবের মাধ্যমে করে তোলে দৃষ্টিগ্রাহ্য, বোধক্ষম। দর্শনীয় ও বিশিষ্ট করে তোলার এই প্রক্রিয়ার প্রধান প্রেক্ষিত নিঃসন্দেহে তাৎক্ষণিকতায় নিষিক্ত। কিন্তু সমকালীন ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-বিষাদ, আশা-নিরাশা কিংবা ক্রোধ-কান্না-প্রতিবাদের সার্থক প্রতিভূ হয়েও কোন কোন সৃষ্টি তার ব্যক্তিগত কিংবা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পথ ধরে অতিক্রম করে যায় সমকালের আঙ্গিনা। পারানির সদ্ব্যবহার করেও যাত্রা তাদের কালান্তরে। কিন্তু তবু ভবিষ্যত কালের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মুক্তি দেয়না তাদের, ব্যবহার করে পরিপূর্ণ শক্তিতে—কখনো সংগ্রামে, কখনো দুঃখ-হাসির সঙ্গি রূপে, কখনো বা বিশ্রামের অথবা নিটোল অবকাশ সৃষ্টির আল্পনা এঁকে তুলে। সমকালীন প্রয়োজনের দাবি মিটিয়ে কালান্তর যাত্রায় শিল্পকলার দ্বিতীয় বা পর্যায়-ক্রমিক নবজন্ম ঘটে নবতর প্রয়োজনের কক্ষে। উৎকর্ষের এই সময়ান্তরিক সার্থকতা তথা কালান্তর-যাত্রাই হয়তো কারো কারো দৃষ্টিতে 'কালাতীত মহিমা'র নাম-গরিমা অর্জন করেছে।

চল্লিশে কিংবা সত্তরে রবীন্দ্র-রচনা প্রধানত যে অভিযোগের সম্মুখীন তা বিশেষভাবে সংগ্রামী বলিষ্ঠতার তথা শ্রেণী চেতনার অভাব সম্পর্কিত। অর্থাৎ সংগ্রামে, অভ্যুত্থানে, মিছিলে রৈবিক সৃষ্টির ভূমিকা অস্পষ্ট বা নেতিবাচক। এ প্রসঙ্গে একটি বহু-নন্দিত তত্ত্বের সূত্র অনুসরণ করে বলা যায় যে রবীন্দ্র-রচনার বিচার বিশ্লেষণ অন্যান্য শিল্পকলার বিশ্লেষণের মতোই তার সমকালীন দেশ কাল ও সমাজ-বাস্তবতা-বহির্ভূত নয়। অর্থাৎ সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং তার বাস্তব

বিন্যাস ও স্তরোন্নতি, জাতীয় পর্যায়ে গণ-সচেতনতা এবং সার্বিক বিচারে আন্দোলনের গুণগত উচ্চতা ও মান এবং সেই সঙ্গে পূর্ব-ঐতিহ্যের সচেতনতার মানদণ্ড প্রভৃতি উপকরণের ব্যাপক ক্যানভাসে বিশ্লেষণ যে কোন শিল্পসৃষ্টির মূল্যায়ন ও চরিত্র নির্ধারণে অপরিহার্য। তাই রবীন্দ্র রচনার বিশ্লেষণে তৎকালীন উপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গণতান্ত্রিকতার আপেক্ষিক প্রগতিশীল বিকাশ এবং সংগ্রামের দ্বিধা দ্বন্দ্ব-পশ্চাদটান, শ্রেণী-চেতনার ক্ষীণধারা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপাদান-গত ও গুণগত মূল্যায়ন ও পরিচয়-গ্রহণ অতি-আবশ্যিক সর্ত। এবং সেই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় তৎকালীন প্রগতির পরিবেশ-নির্ভর সীমাবদ্ধতার প্রতি। এ কারণেই রবীন্দ্র-রচনাকে তার পরবর্তীকালের শ্রেণী-চেতনার ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিবেশের আকাঙ্ক্ষিত আলোকে টেনে না এনে তার সমকালীন চৌহদ্দিতে রেখেই তার ভালো-মন্দ, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, খ্যাত-অখ্যাত, দ্বিধা-সংশয় জড়িত বা সংযত প্রকাশময় সৃষ্টির নির্ভুল বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং রবীন্দ্র-রচনার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তবতার পরিচায়ক বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা মনে করি তাঁর জন্ম রূপার চামচ মুখে নিয়ে ; (অবশ্য এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জবানবন্দি ভিন্নতর। তাঁর ভাষায় ; "আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরীবের মতো,"...ইত্যাদি।) তাঁর বয়োবৃদ্ধ বুর্জোয়া উদারতার সচ্ছলতায় এবং মানসিক ও সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের এমন এক পরিবেশে যেখানে ঠাকুর বাড়ীর শিক্ষিত-মার্জিত রুচির প্রকাশে এবং সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনায় চারিদিক চকিত হয়ে উঠতো ; ছেলেদের মুক্ত-প্রাণ চৈতন্য কখনো সংস্কৃতিগত কারণে, কখনো বা স্বাদেশিকতার নিরিখে শাসক-বনিকের সাথে প্রতিযোগিতায় স্বার্থ ও সচ্ছলতার জাহাজ-ডুবি ঘটাতে এতটুকু দ্বিধা করতোনা (প্রসঙ্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক এ্যাডভেঞ্চার স্মরণযোগ্য)। একদিকে ব্রাহ্ম-উদারতার সাথে বেদ-উপনিষদের তাত্ত্বিক মিশ্রণ যেমন এক অদ্ভুত সংকর পরিবেশ গড়ে তুলেছিলো, অন্যদিকে সেই চৈতন্যের আরেক চোখ প্রসারিত ছিলো ভাবীকালের রৌদ্রময়তার দিকে, যেখানে সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধির অন্ধকার বড় একটা প্রশ্রয় পায়নি। দেশজ ঐতিহ্যের বুনিয়াদে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার যে মুক্তধারা স্বকীয়তায় সিদ্ধ, তারই সচ্ছল প্রবাহে সে বাড়ীর আঙ্গিনা ছিলো স্বচ্ছ। এমনি

একটি বৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত পরিবেশে আধুনিক-চেতনার সৌর-উত্তাপে রবীন্দ্রনাথ বয়সের কাঁচা সিঁড়ি গুলো পার হয়েছিলেন।

শুধু পরিবেশের স্বচ্ছতা এবং সচ্ছল সমৃদ্ধি'র প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও এ বিশ্বাস প্রায় সর্বজনীন যে রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক সৌভাগ্য ঈর্ষণীয়। যেন তিনি এলেন, দাঁড়ালেন, জয় করলেন। কিন্তু বাস্তবে রৈবিক সৃষ্টি ও তার সাফল্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নতর। জীবন ভর এই তথাকথিত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটিকে যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, তা একদিকে যেমন অনুধাবন-সাপেক্ষ, তেমনি সেই অনুধাবন অনায়াস-সাপেক্ষ নয়। কিন্তু তা চিত্তাকর্ষক এই জন্য যে লড়াইয়ের ক্ষেত্র ও কারণ যেমন ব্যাপক ও বহুমুখী, তেমনি কখনো কখনো বিপরিত-মেরু কেন্দ্রিকও বটে। সব্যসাচীর পারঙ্গমতা নিয়ে তাকে লড়তে হয়েছে সামাজিক রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক হীন-অনাচারের আবরণ খুলে ধরতে, সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার ভ্রান্তচারণার বিরুদ্ধে। কিন্তু সর্বোপরি স্বদেশে বিদেশে রাজনৈতিক বাস্তবতা ও সার্বিক কল্যাণবোধের স্বপক্ষে কণ্ঠ মেলাবার প্রয়োজনে প্রাচীন বিশ্বাস ও লালিত ভাবনার কিছু কিছু মোটা মোটা শিকড় তুলে ফেলার চেষ্টায় যে আত্মদ্বন্দ্ব ও চেতনার অন্তর্লীন স্ববিরোধিতার মুখোমুখী তাঁকে হতে হয়েছে তা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এবং এই দ্বন্দ্বজাত ক্ষতমুখ বরাবরই ছিলো উন্মুক্ত। আজ রবীন্দ্র-ব্যবচ্ছেদের পূর্বাহ্নে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো দরকার : কেন এই সৌন্দর্য-তত্ত্বে দৃষ্টি-নিবদ্ধ, ভক্তি-চেতনায় আকৃষ্ট মানুষটিকে তার সমকালের আঙ্গিনা পেরোতে এত বাঁধা, এত নিন্দা এবং এত ব্যাপক বিতর্কের অমসৃণ তিক্ততার সম্মুখীন হতে হয়েছে ? এর কারণ কি তার কালানুপাতিক অগ্রসর-চিন্তা ও বাস্তবধর্মী বিচক্ষণতার ব্যাপ্তি, যা ভবিষ্যত-চেতনায় বিদ্ধ প্রতিভার বেলায় প্রায়শই দেখা যায় ?

তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'কড়ি ও কোমল গ্রন্থে (যার মধ্যে কবির ভাষায় 'অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে') মানুষের সুখ-দুঃখের বাস্তব-ঘ্রাণ নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস এবং তারুণ্যের বাধাবন্ধহীন আবেগে পুরনোকে বর্জন ও স্বাদেশিকতায় মানবিক চেতনার পরিস্ফুট চমক বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অনড় ধ্বজধারীদের সহ্য হয়নি। শুরু হয়েছিলো তিক্ত কটু আক্রমণ। কাব্যবিশারদ (কালিপ্রসন্ন) থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত অনেক অনেক নামী দামী সাহিত্য-বিশারদ ও বিচারক এক সারিতে দাঁড়িয়ে

আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। কিন্তু যৌবনের প্রবল তেজে কবি নির্ভয়ে সেসব উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন এবং "আর্যতেজদর্প" সংকোচহীন পরিহাসে উড়িয়ে দিয়ে বলতে পেরেছেন "স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রু জলে।" এমন কি যৌবনের এই উত্তাপে আধুনিকতার পাঠ নিয়ে বাংলা কবিতায় জীবন-তৃষ্ণার দুরন্ত আশা-জনিত গতিবেগ সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর কাব্যজীবনের সৃষ্টিশীলতার প্রতিটি বাঁকে বা বিশিষ্ট পর্বে প্রায়শঃই দেখা গেছে দক্ষিণী রক্ষণশীলতার কটুভাষণ তিক্তভাষণে রূপান্তরিত। এমন কি বিশুদ্ধ রস-তাত্ত্বিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও সাংসারিক ঘরকন্নার ধুলোমাটিতে কবিতার অঙ্গ মলিন করা এবং প্রেমের পটভূমিতে কেরানী-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি অকুণ্ঠিত কলমে আঁকার অপরাধে ধিক্কার দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। আবার অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে যে কবি লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণী উপেক্ষা করে আনন্দ মঙ্গল ও উপনিষদিক মোহ বিস্তার করে বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছেন। এই দুই বিপরীত অভিযোগের বিরুদ্ধেই কবি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যজীবনে দুইমহলের অস্তিত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরিত্য উপস্থিত, তা পাশাপাশি সমষ্টির বৈচিত্র্যময় রেখা চিত্রণে এবং ব্যক্তিকতায় আশ্রিত সৌন্দর্যের নিঃসঙ্গ বিকাশের দুই স্বতন্ত্র স্রোতের মতো প্রবহমান। এই দুই বৈপরিত্যের অস্তিত্ব নিয়েই যত সমস্যা, সংশয় ও জটিলতার উদ্ভব এবং দুই বিরোধী মেরু থেকে সমভাবে আক্রমণের পালা বজায় রয়েছে।

কবিতা-গল্প-নাটক ছেড়ে রাজনীতির অঙ্গনেও সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য ও মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন ইংরেজী দৈনিকে তাকে "চরমপন্থী" রূপে চিহ্নিত করা হয়, তখন প্রায় একই কারণে তার মতের সাথে গরমিল হবার দরুণ স্বদেশীদের কাছ থেকে জোটে অবজ্ঞা। পদ্ধতি বিচারে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন না করে হন অপ্রিয়, অন্যদিকে চরকা-খদ্দর, কাপড় পোড়ানোর জবরদস্তি এবং আবেদন-নিবেদনের পথ মেনে নিতে না পারায় বর্ষিত হয় নিন্দা। একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের অসমর্থন যেমন বিদেশী-প্রীতি রূপে চিহ্নিত হয়, তেমনি অন্যদিকে স্বাদেশিকতার জাতীয় মঞ্চে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে সোচ্চার হবার দরুন ঝলসে ওঠে উপেক্ষা, ইংরেজি জ্ঞানের উপর কটাক্ষ। বঙ্গভঙ্গ ও হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে তাঁর মতামত যেমন হয় অবহেলিত, তেমনি জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধের ক্ষেত্রে বামপন্থী বাংলা-বাদী অংশ তথা সুভাষ বসুকে সমর্থন করে হন নিন্দিত। বাস্তব-

চিন্তার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তি এবং ভঙ্গি-সর্বস্ব শৌখিনতার বিরোধিতায় সুস্পষ্ট ভূমিকা রক্ষণশীল সাহিত্যরক্ষীদের দ্বারা হয় আহত, কিন্তু পায়না সমকালীন আধুনিকদের সমর্থন।

অর্থাৎ তাঁর চলার পথ মোটেই ছিলোনা নিরংকুশ কিংবা নিরুপদ্রব, আর এর নাম কি সৌভাগ্য ? ঈর্ষান্বিত হওয়া যাবে কি কবির শরাহত প্রাত্যহিকতায়, একমাত্র মহাভারতের ভীষ্মের সাথে যার তুলনা চলে ? কিন্তু ভীষ্মের মতো ইচ্ছামৃত্যুর বর তো তাঁর ছিলোনা, আর কাম্য ছিলোনা সম্ভবত শরশয্যার সুখ ! বরং ‘মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি’ অঙ্গে মেখে মৃত্যুহীন জীবন-যাপনের সাধ ছিলো আন্তরিক। তাই কবিতার প্রথম সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে উচ্চারিত হয়েছিলো পৃথিবীর জন্য মমতা আর মানব সমষ্টির সাহচর্যের লোভ ঃ “মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।”আর এই আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন রঙে পূর্বাপর তাঁর কবিতার উদ্যানে পরিস্ফুট। জীবন-যাপনের এই চিত্রকর একদিকে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও ভক্তিবাদের চর্চায় মনোনিবেশ করেও সাহিত্যের নিভৃত রস-সম্ভোগের কক্ষে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেননি পুরোপুরি। আর পারেননি বলেই পাশাপাশি দ্বিতীয় স্রোতে গা ভাসাতে হয়েছে তাঁকে, যেখানে মানুষের প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখে রক্তহীন, পান্ডুর মুখশ্রী তুলে ধরা যায় ; যেখানে রক্ত ঝরে বিত্তহীন, হৃতস্বাস্থ্য মানুষের প্রতি সমবেদনায় ; সোচ্চার হয়ে উঠা যায় নির্যাতীতের স্বপক্ষে।

শিল্পীজীবনের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত দুইস্রোতে অবগাহন-রত। এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ গুলো হচ্ছে (ক) তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিবেশন ; (খ) সমকালীন যুগ-সংকট, জটিলতা ও সামাজিক বিকাশের অবস্থা ; (গ) সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, ঊনিশ-শতকীয় বৈপরিত্যময় সাংস্কৃতিক জাগরণের পথ বেয়ে, দুই বিপরিত স্রোতের উপস্থিতি—যেখানে রক্ষণশীলতার টানই ছিলো প্রবলতর (ঘ) সর্বোপরি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় আলোকিত বৃহত্তর মানবিক-চেতনার পলিমাটিতে পুষ্ট বৈবিক মনন-ধর্মিতা। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে বৈবিক চৈতন্যের নদীতে পর্যায়ক্রমে যখন দ্বিতীয় স্রোতটি বেগবান হয়ে উঠেছে, তখনো জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে উদার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারায় পুষ্ট বলিষ্ঠ প্রগতিশীলতার যাত্রাপথ প্রশস্ত হয়ে উঠেনি, যা পরস্পর-নির্ভরতায় প্রভাবিত করতে পারতো সংস্কৃতির সম্ভাবনাময় উদ্যান। উপনিবেশিক-শাসনের অভিশাপ বুকে নিয়ে এদেশের জাতীয় জাগরণে

সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধিতা, অতীত-মুখীনতা প্রভৃতি উপকরণের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে শোকাবহ ঘটনা, যা প্রকারান্তরে জাতীয়তাবোধের প্রগতিযাত্রার ঝুঁটি ধরে টুঁটি চেপে বসেছিল। একথা বলার তাই অপেক্ষা রাখেনা যে রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যবচ্ছেদের পূর্বাহ্নে উল্লিখিত বিষয়চিত্র আমাদের চেতনায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

হ্যাঁ, তাঁকে আমরা কেউ কেউ দেখাতে চাই সৌন্দর্যবাদী, রাজনীতি-নিরপেক্ষ, সংশয়ী তাত্ত্বিক শিল্পী রূপে। কিন্তু তার ফলে রবীন্দ্রনাথের লাশ যদি রক্ত-চিহ্নিত রাজপথ থেকে উঠে আসে, উঠে এসে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় তাঁর ইতিবাচক, কালান্তর-যাত্রী রচনাবলীর সাথে ; যদি প্রতিবাদ জানাতে চায় তাঁকে অধ্যাত্মবাদের আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ ঢেকে উপস্থিত করার চেষ্টায় রত নান্দনিক শিল্পীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিংবা তাঁর কালের পরিবেশ-নিরপেক্ষ বিচার-জনিত ভ্রান্তির বিরুদ্ধে,—তখন যুক্তি ন্যায় ও বাস্তবতার টানে আমাদের একটু থমকে দাঁড়াতে হয়, এই বিচিত্রমুখী শিল্প স্রষ্টার চৈতন্যের মূল্যায়ণে যথার্থ মানদণ্ডটি খুঁজে বের করার জন্য শ্রম-সাপেক্ষ পর্যালোচনার পথ ধরে এগুতে হয়, যাতে করে বাস্তব সত্যের বদলে আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব বা সত্য প্রধান হয়ে না ওঠে।

আমরা জানি, রৈবিক সৃষ্টি বিভিন্ন পর্বে ও পর্যায়ে বিভিন্ন সমান্তরাল ও বিপরীত স্রোতের ধারা-উপধারার বিচিত্র ও জটিল সমন্বয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে ; একটি মোটা একমুখী সমান্তরাল ধারার প্রবাহে চিহ্নিত নয় রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী সৃষ্টি। তাই রবীন্দ্র মানসের প্রকৃতিগত পরিচয় নির্ধারণে এবং তার সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টির বাস্তব মূল্যায়নে প্রতিটি ধারা-উপধারার অন্তর-প্রকৃতি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে কিছুটা পরিচয় নিতে হয় প্রাক-রাবীন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারার, এবং দেখতে হয় রাবীন্দ্রিক শিল্পকলার ঐতিহ্য বিষয়ে-প্রকরণে উত্তর-সাহিত্যের আধুনিকতায় কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। সম্ভবতঃ এই পথেই রবীন্দ্র-রচনার ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকার বিশ্লেষণ এবং রবীন্দ্র মানসের তথা তাঁর সৃষ্টিশীলতার অনাবেগ মূল্যায়ন সম্ভব।

রাজনীতির জটিল উদ্যানে

প্রশ্নটি বহুল প্রচলিত: শিল্প-সাহিত্যের পরিতৃপ্ত আস্বাদের আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কি রাজনীতি-চিন্তা থেকে নিজেকে শতহস্ত দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন? রাজনীতি-চর্চায় তাঁর ভূমিকা বা সংশ্লিষ্টতা কতখানি? এ প্রশ্ন দুটোর যথাযথ জবাব পেতে হলে আমাদের যেতে হয় প্রধানতঃ তাঁর প্রবন্ধাবলীতে, চিঠিপত্রে, নাটকে, কার্যকলাপে এবং অংশতঃ কবিতা গান ইত্যাদি সাহিত্য সৃষ্টির অন্যান্য ধারায়। এই প্রসঙ্গে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তাঁর সমসাময়িক কালের এবং অন্ততঃ কয়েক দশক পূর্বেকার সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুধাবন, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কবির ভাবনা-চিন্তার প্রকৃতি নির্ধারণ।

বিষয়টি বিতর্কমূলক হওয়া সত্ত্বেও এ সত্য সম্ভবতঃ অস্বীকার করা যাবেনা যে উনিশ শতকীয় নবজাগরণে জাতীয় প্রগতির সূচনা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যে-ভাবালুতার স্রোত সেখানে প্রবল শক্তি নিয়ে উপস্থিত ছিলো, তার প্রধান প্রবণতা ছিলো সংস্কারবাদের আঁড়ালে ভক্তিবাদের দিকে। একদিকে বিজ্ঞানধর্মী আধুনিক শিক্ষার প্রভাব অন্যদিকে অতীত ইতিহাস ও সনাতন ভারতের পুনর্জাগরণের প্রতি মোহ একই সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাই ১৮৩১ থেকে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরে যে-উপনিবেশ-বিরোধী এবং সামন্ত-বিরোধী আন্দোলন বা কার্যক্রম জন্ম নিয়েছিলো তাতে প্রবলভাবে এসে মিশেছিলো ধর্মপ্রভাব এবং ধর্মসংস্কারবাদিতার উপকরণ। একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরণ-প্রচেষ্টার প্রবল অভিক্ষেপ এমন ব্যাপকতায় অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছে গেলো যে এর প্রতিক্রিয়ায় আত্মরক্ষা তথা ধর্ম রক্ষার তাগিদে রামমোহন-দ্বারকানাথের উদার ব্রাহ্মধর্মের পথ ধরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো উদারপন্থীদের পর্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে হোল ইংরেজ-বিরোধিতায়, অবশ্য

সামাজিক পর্যায়ে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার বাস্তবিক প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ফুটে উঠল রক্ষণশীল সমাজের পুরোধাদের হাতে, প্রধানতঃ হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের মাধ্যমে। ব্যাপক ভাবে জেগে উঠল ধর্মসভা ; ধর্মসংস্কার আন্দোলন, এমন কি এরই সূত্র ধরে দেখা দিলো 'গোহত্যা নিবারণী' আন্দোলন (১৮৮২), ধর্মরক্ষিণী সভা (১৮৭৩) ইত্যাদি। স্বভাবতই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর কার্যকরী প্রভাবের ফলে 'জাতীয়তার আদর্শ' সমন্বয়ের পথ না ধরে 'হিন্দু জাতীয়তার আদর্শে' রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এর ভাবমূর্তি দেখা দেয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বংকিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রঙ্গলাল প্রভৃতির ক্রমান্বয়ী আত্মপ্রকাশ এবং সনাতনী আদর্শের আবির্ভাবের মধ্যে। এর বিষাক্ত প্রভাব আমরা দেখতে পাই পরবর্তী যুগের রাজনীতিতে, যখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রচণ্ড আত্মত্যাগী মহিমার মধ্যেও জ্বলতে থাকে সনাতন ধর্মের শিখা ; বেদ বা আনন্দমঠ হাতে কিংবা কালিমন্দিরে তরুণ বিপ্লবীদের দীক্ষা নেবার পদ্ধতিতে যার অভিব্যক্তি চোখে পড়ে। এমন একটি পরিস্থিতি উপমহাদেশের রাজনীতিতে উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক মিলনের অনুকূল নয়, বলাই বাহুল্য।

আবার, একই সঙ্গে মুসলমান-বিরোধিতা যেমন এইসব রক্ষণশীল সাহিত্যের তথাকথিত জাতীয়তাবোধে প্রাধান্য পায়, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বিদেশী-শাসনের প্রতি আনুকূল্য, যা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এমন কি এরা উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতায়ও কুণ্ঠিত হননা ঃ

> "সমাজ বিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র—বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরাজ এদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"(১)

কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত গণস্বার্থ বিরোধী, সামন্ততন্ত্রের সমর্থক ঃ "আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে-বন্দোবস্ত ইংরাজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহা ধ্বংস করিয়া তাহারা এই ভারত-ভূমণ্ডলে মিথ্যাবাদী হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দেইনা" (বঙ্গদেশের কৃষক ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। তাই ইংরেজের 'মুদ্রাযন্ত্র আইন' সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে অমৃতবাজার পত্রিকার ক্ষুব্ধ মন্তব্য চিত্তাকর্ষক ঃ "বঙ্কিম বাবুর এই দুষ্ট মন্তব্য ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রভুর অনুমোদন লাভ করিয়াছে।"

প্রায় একই সময়ে মুসলমান সমাজেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সমান্তরাল বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বাংলায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের কৃষক

বিদ্রোহ জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও তার আন্দোলনের সাংগঠনিক অভিপ্রায় ছিলো স্থানীয় ইসলাম ধর্মের সংস্কার-সাধন। এর কিছুকাল পর সংগঠিত ফারাজি আন্দোলন তো মূলতঃ ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন। বিষয়টি কার্যকারণ সম্বন্ধে আকস্মিকতায় বিধৃত এই অর্থে যে রায়তের বিপুল অংশ ছিলো দরিদ্র, অনগ্রসর মুসলমান এবং ঐতিহাসিক কারণেই জমিদারদের অধিকাংশই ছিলো হিন্দু (লক্ষ্যণীয় যে উত্তরভারতে ঘটনা ছিলো অন্যরূপ, সেখানে মুসলমান নবাব-জমিদারের সংখ্যা ছিলো পর্যাপ্ত) তাই উৎপীড়িত মুসলমান প্রজাকে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছে জমিদার (হিন্দু) দের বিরুদ্ধে ; এক্ষেত্রে অনাহূত ভাবেই শ্রেণীস্বার্থের ক্ষেত্রে ধর্ম-স্বার্থ বা সম্প্রদায়-স্বার্থ সজোরে অনুপ্রবেশ করে পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয়তার আদর্শকে বিখণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এ ছাড়াও সিপাহীবিদ্রোহের মতো অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখদের প্রকাশ্য বিরোধিতা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি হিন্দু-রিভাইভালিজমের সাথে পাল্লা দিয়েই যেন জেগে উঠল ইসলামী-জাগরণের ঢেউ, সঙ্গে এলো ইংরাজ রাজভক্তির অকুণ্ঠ প্রকাশ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদের "রাজভক্ত মুসলমান" গ্রন্থ যেমন উল্লেখযোগ্য, তার চেয়েও তাৎপর্যময় ১৮৭০ সালে উত্তর ভারতীয় ধর্মনেতাদের 'ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রামের' বিরুদ্ধে ফতোয়া, এবং ১৮৭১ সালে কেরামত আলী জৌনপুরীর ইংরাজ-শাসন সমর্থনের সুপারিশ। আরো লক্ষণীয় 'তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া'র কলিকাতা সম্মেলনে ইংরাজ-শাসনের স্বপক্ষে প্রস্তাব এবং ১৮৬০ সাল থেকে নওয়াব আবদুল লতিফের ইংরাজ সমর্থনে নিরলস কার্যক্রম।

অথচ এরই পাশাপাশি দেখা যায় সামগ্রিক জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং সম্প্রদায়-নিরপেক্ষবোধে দীপ্ত বিভিন্ন আন্দোলন এবং কার্যক্রম, যা সিপাহী বিদ্রোহের এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) প্রসঙ্গ বাদ দিলেও ব্যাপক নীলবিদ্রোহে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) এবং ছোটখাট নানা ধরণের প্রজা-বিদ্রোহে উচ্চকিত। পরবর্তী পর্যায়ে ইণ্ডিয়ালীগের প্রতিষ্ঠায় এবং শাসক-বিরোধী আন্দোলনে এই প্রতিরোধী চেতনার প্রতিভাস দেখতে পাই। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এরই সমান্তরাল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে হরিশ মুখার্জির সুতীব্র লেখায় এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের দৃপ্ত বক্তব্যে। একই সময়ে দেবত্ব মহিমার আবেশ ছিন্ন করে মধুসূদনের স্বাদেশিকতা 'মেঘনাদ বধে'র প্রতীকে যেমন দীপ্ত হয়ে উঠল, তেমনি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় শাসক-বিরোধী, নীলকর-বিরোধী বক্তব্যের

ঝলসানি দেখা গেল (উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশ কাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৬০ সালে নীলচাষীর মর্মন্তুদ বেদনা নিয়ে 'নীলদর্পণ'-এর প্রকাশ যেন প্রতিরোধ সাহিত্যের হীরকদীপ্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'নকশা' 'নীলদর্পণ' 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন প্রধান স্রোত নয়। তাই দেখি, এ সময়কার প্রায় অর্ধশতক কালের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উপপ্লবে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর এক বৃহৎ অংশের ভূমিকা হয় বিচ্ছিন্নতার, না হয় বিমুখতার কিংবা বিরোধিতার।

উপমহাদেশের জাতীয়-জীবনে নিঃসন্দেহে এ একটা অভিশাপ যে উপনিবেশিকতার বিষাক্ত ছায়ায় এখানে রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয়-চেতনার বিকাশ প্রধানতঃ ধর্মীয় সংস্কারবাদিতার সূত্রপথে। এর ফলে এখানকার দুটো প্রধান ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জাতীয়-চেতনার প্রাঙ্গণে জাতীয় স্বার্থকে প্রধান বিষয় রূপে দেখতে পারেনি। তাই উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রাচীন ধর্ম-নির্ভর ঐতিহ্যাশ্রয় ভেঙ্গে যুগাবসানের প্রয়োজনীয় ব্যাপক-ভিত্তিক, বলিষ্ঠ মতাদর্শ যেমন গড়ে ওঠেনি, তেমনি ধর্ম-ভিত্তিক সংস্কারবাদী মনোভাব রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্যকরী থাকায় ঐতিহ্যগত পিছুটান হিসাবে জাতীয় আন্দোলনে বরাবরই একটি আত্মবিরোধী মিশ্র প্রভাব সক্রিয় থেকেছে। কী জাতীয়তাবাদী কী বিপ্লববাদী, সব জাতীয় আন্দোলনেই দেখা গেছে ভক্তিবাদের পলি, গুরুবাদের আগাছা। তাই বিশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ আপন সদিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছে। রাজনীতিতে দেখা গেছে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জমিয়তে-উলামায়ে-হিন্দ্ কিংবা অনুরূপ সব প্রতিষ্ঠান ; কংগ্রেসও এর বড় একটা ব্যতিক্রম নয়।

এই সব কার্যকারণের পটভূমিতে স্বাদেশিকতার উৎসমুখে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার অভ্যুদয়, তাতে সংঘবদ্ধ-শক্তির অভাব ঘটেছে ; সেই সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো সর্বোচ্চ-নেতৃত্বে ধর্মের তথা সামন্ত প্রতিভূদের শ্রেণী-স্বার্থের প্রভাব। স্বভাবতই এই সব বিচিত্র-স্রোতের উজানভাটির টানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ বিরোধিতার বদলে প্রধান হয়ে উঠে "আবেদন নিবেদনের" ঢেউ। স্বায়ত্ত-শাসনের পিচ্ছিল পথে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে থাকে। জাতীয়-কংগ্রেসের পথ বলিষ্ঠ সংগ্রামের এবং সর্বজনমনের প্রতিভু হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। খিলাফত-অসহযোগের সাময়িক আনুকূল্য সত্ত্বেও ঘটনায় কোন গুণগত পরিবর্তনের উপকরণ বা অনুঘটক সংযোজিত হয় না। এমন কি রুশ বিপ্লবের আত্যন্তিক

প্রভাবও তেমন কোন আকস্মিক পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে উঠেনা। হয়তো তাই কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনেও হসরত মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজী কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য এসবের পেছনে ইংরেজ শাসনের সুচতুর ভেদবুদ্ধির প্রভাব যেমন ছিলো (১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে যা পরিস্ফুট), তেমনি ছিলো সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার ও রক্ষণশীলতার পিছুটান, বৃহত্তর জনমানসের অশিক্ষা ও অনগ্রসরতা, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্ববিরোধী ও বৈপরিত্যময় মিশ্র স্রোতের পিছুটান। প্রসঙ্গত অনুধাবনীয় যে জাতীয়-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসক দ্বিমুখী নীতির ধারালো ফলকে মুসলিম লীগের জন্ম ত্বরান্বিত করেছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তার যে আন্দোলন-মঞ্চে মুসলমান নেতাদের ইংরাজ-বিরোধী ভূমিকা নিয়ে আবির্ভাব, সেখানে সবাই ছিলেন অবাঙালী। বাঙালী জাতীয়তার বিকাশে ও স্বার্থে তাদের ভূমিকার বিশেষ কোন কার্যকরী প্রভাব দেখা দেয়নি। শিক্ষার অভাবে বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান সমাজ ছিলো বিত্তহীন অবহেলিত, এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ন্যূনতায় নেতৃত্বের চরিত্রও ছিলো সামন্তবৃত্তে অবস্থিত ; শ্রেণীস্বার্থের সেক্ষেত্রে ধর্মকে আশ্রয় করে পরিস্ফুট হবার সুযোগও বর্তমান ছিলো প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের শিক্ষায় অগ্রসরতার এবং তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে।

তাই বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে আরো একটি বিপরিত উপস্রোত সংযোজিত হয়েছিলো মাত্র। নওয়াব লতিফ কিংবা নওয়াব সলিমুল্লাদের প্রভাব মুসলিম জনমানসে অধিকতর সক্রিয় ছিলো, কিন্তু উত্তরভারতের ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাব এ অঞ্চলের জনমানসে অনুভূত হয়েছে কম। তাই জাতীয়তা তথা বাঙালী জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালীর জাতীয়তাবোধের সমার্থক হয়ে উঠেছিলো ; মুসলমান তথা দরিদ্র কৃষক-শ্রমজীবী বা নিম্নবিত্ত মুসলমানের প্রাণের যোগ ছিলোনা এর সাথে। সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালীর পর্যাপ্ত সংখ্যায় আবির্ভাব হয়তো এ অবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পারতো, কিন্তু সেক্ষেত্রেও হিন্দু-প্রধান বাংলা সাহিত্য তেমন কোন কার্যকরী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

এমনি একটি অদ্ভুত জটিল ও বিচিত্র পরিবেশের ঐতিহ্য ও উপস্থিতিতে রাবীন্দ্রিক সাহিত্যসাধনার ব্যাপ্তি, যদিও তাঁর জন্মলগ্ন কয়েকটি বিদ্যুতদীপ্ত ঘটনার আবহে জারিত। ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষে

(ক) মাইকেলের স্বাদেশিকতার দীপ্তি নিয়ে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের আবির্ভাব, (খ) 'নীলদর্পণ' অনুবাদের দায়ে রেভারেন্ড লং-এর কারাদণ্ড, (গ) বিদেশী-শাসনের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপের শরসন্ধানী দীপ্তি নিয়ে কালিপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রকাশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তরুণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার কালে উপমহাদেশে ভক্তিবাদী জোয়ারের প্রবলতা দেখা গেছে যেমন একদিকে, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রবণতা ছিলো আপোষরফার মসৃণ পথে স্বায়ত্ত-শাসনের মোক্ষ লাভ কামনায়। সামাজিক ক্ষেত্রে ছিলো অনাচার, অন্ধতা ও রক্ষণশীলতার প্রবল অভিক্ষেপ, এমন কি এককালের উদার-মূল্যবোধে স্নাত ব্রাহ্ম সমাজেও জমা হয়েছিল যথেষ্ট আবিলতা।

এসব পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে তরুণ বয়স থেকেই স্পর্শ করেছিলো, তাই তাঁর স্বাদেশিক চিন্তা একাধারে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কক্ষ স্পর্শ করেছিলো। এবং তরুণ বয়সেই তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীতে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন, কখনো কখনো কর্মে এবং সর্বদাই অজস্র রচনার মাধ্যমে। তাই তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর আয়তন রীতিমত গুরুভার। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও বক্তব্য শুধু উপনিবেশিকতা, সামাজিক রক্ষণশীলতা ও অনাচারের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি জাতীয় আন্দোলনের স্বপক্ষে নিজেকে উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত থাকে নি। সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায়, মানবিকতা ও বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে এবং দেশের বিত্তহীন সমাজ, বিশেষতঃ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও তাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের পরিকল্পনায় তিনি বলাবাহুল্য নিজস্ব ধ্যানধারণার শিখায় তাঁর রাজনীতির কক্ষটি আলোকিত করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট বিকাশ প্রধানতঃ উনিশ শ' সালের প্রথম দিক থেকেই, যখন তিনি স্বাদেশিকতার প্রশ্নে আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও জাতীয়তার সংজ্ঞায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, ইংরেজ শাসনের স্বরূপ ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে আপন বিশ্লেষণগত বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু এরও আগে আঠারো-শ' সালের শেষ পাদে কবি বঙ্গ সমাজে জাতীয় জাগরণের সম্ভাবনাও প্রত্যাশা করেছেন, আহ্বান করেছেন ত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ হতে :

> "ওয়াশিংটন যখন নূতন জাতির স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি মরিতেও পারিতেন। নিরুদ্যমই প্রকৃত মৃত্যু। আমরা হয় বাঁচিব, না হয়

> মরিব। তোমার কি ভয় হয় পাছে তোমার বংশে বাতি দিবার কেহ না থাকে। জিজ্ঞাসা করি—এখনই বা কে বাতি দিতেছে! সমস্তই যে অন্ধকার।"(২)

শুধু কি তাই। সাধনা পত্রিকায় এ সময়কার রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী শাসক ইংরেজের উপনিবেশবাদী নীতির সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছে। বিষয়টি চিত্তাকর্ষক এই কারণে যে তখনো জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ভূমিকা ছিলো আপোষবাদের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেসময় থেকে পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ও দেশের জনসমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন যে "আবেদন আর নিবেদনের থালা" নয়, স্বীয় ক্ষমতায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ঃ

> "আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন 'সাধনা' কাগজে (১৮৯৩—৯৪) লিখছিলুম, তখন ইংরেজি শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবেনা, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে।"(৩)
>
> "১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি বাঙালীকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।"(৩)

আত্মশক্তি বলতে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার কোন চিত্র-চরিত্র বোঝাতে চেষ্টা করেননি। বরং রৈবিক স্বাদেশিকতার পটভূমিতে আত্মশক্তির সদর্থ হলো ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের বৃহত্তম জনসমাজে আত্মমর্যাদা ও শক্তির বোধ জাগিয়ে তোলা, চিত্তবৃত্তিকে সুস্থ, শিক্ষিত ও সংবেদনশীল করে তোলা। উদ্দেশ্য, একটি সচেতন শিক্ষিত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে জাতির রূপরেখা সুনির্দিষ্ট করা। তা না হলে কর্মসূচীবিহীন ইংরেজ-বিতাড়নেই স্বাধীনতার যথাযথ ফললাভ ও ফলভোগ করা যাবেনা। তাই আত্মশক্তি সিরিজের প্রবন্ধাবলীতে রবীন্দ্রনাথ "নেশন" বা জাতির সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন সর্ব প্রথম ঃ

> "অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চরিত্র সৃজন করে তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা এই চারিত্রচিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ততক্ষণ তাহাকে সাচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিঁকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"(৪)

আর এই সঙ্গে চাই ঐতিহ্য ও সমকালে একত্র বসবাসের পরস্পর-সম্মতি

এবং ভূখণ্ড-ভিত্তিক সচেতনতা, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মনোভঙ্গি, কর্ম ও ত্যাগের আদর্শ :

> “নেশন ধর্মমতের ঐক্যও মানেনা। ব্যক্তি বিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট, য়িহুদি অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসী বা জার্মান হইবার কোনো বাধা নাই।”(৪)

রেনাঁর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ আরো বলতে চেয়েছেন যে “জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যত্বই তার শ্রেষ্ঠ উপকরণ”—অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বোধ বরাবরই কবির কাম্য। এই মনুষ্যত্বের চর্চার মাধ্যমে জনঐক্যবোধ গড়ে তোলা ও আত্মশক্তির অর্জনই ছিলো কবির লক্ষ্য। অশিক্ষা, গোঁড়ামী, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, আত্মমর্যাদাবোধের অভাব এবং সম্প্রদায়গত অনৈক্যের উপস্থিতিতে, কবির মতে আর যাই হোক, সামগ্রিক অর্থে সুস্থ ও সার্বিক জাতীয় মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তিনি তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা গুলোকে বারবার আপন মতামত সহ রাজনীতিকদের সামনে তুলে ধরেছেন ; জোর দিয়েছেন শিক্ষার প্রসারের ও কুসংস্কার দূর করার দিকে, গ্রামীন সমাজ ও মানুষের স্বার্থে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এবং সেকাজে মাতৃভাষা ব্যবহারের—যাতে করে দেশের বৃহত্তর অংশের মজ্জায় ও ধমনীতে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, শক্তির সঞ্চার ঘটে। সর্বোপরি স্বায়ত্তশাসনের করুণা লাভের চেষ্টা থেকে বিরত হবার জন্যে তাঁর প্রয়াস ছিলো অবিরাম ও আন্তরিক :

> “দরখাস্ত করিয়া এ পর্যন্ত কোনো দেশই রাষ্ট্রনীতিতে বড়ো হয় নাই, অধীনে থাকিয়া কোনো দেশ বাণিজ্যে স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।”(৫)

রবীন্দ্রনাথের এ তিক্ততার কারণ দুর্বোধ্য নয়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তখনকার রাজনীতির ‘সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে ; দেশের লোকের কাছে একেবারেই নয়।’ এ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> “ইংরেজের নিকট ‘আবেদন-নিবেদন’ করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায় তাহাই স্থায়ী লাভ।
>
> স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক-একটি

> নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।"(৬)

স্বভাবতঃই বুঝতে ভুল হয়না যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কাগজে কলমেই তার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি, অর্থাৎ শুধু রাজনীতি-চিন্তা নয়, রাজনীতি-চর্চাও কিছুটা করেছিলেন তিনি। সেই চর্চার বোধ অন্তরে বহন করেই তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশের অধিকার অর্জন করেছিলেন ঃ

> "ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ না করি। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে, হে মহামারী তুমি আমাদের বান্ধব—হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়।"(৭)

বিষয়টি আরো তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে ইংরেজ তার শাসকসুলভ ভেদবুদ্ধির নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিষয়ে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্তির কাজে ব্যবহার করছিলো যার ফলে উভয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো বিস্তর। এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচক্ষণতা ছিলো জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চেয়ে অধিকতর। তাই হিন্দুসমাজকে যেমন পাল্লা দিয়ে শাসকের প্রসাদ গ্রহণে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, অন্যদিকে নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের উপর জোর দিয়েছেন। কারণ, উপনিবেশিক শাসকের চরিত্রই হ'ল বিভেদ নীতির মাধ্যমে আপন উপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করা ঃ

> "আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবেন, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব, এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।"(৮)

আর এ প্রসঙ্গেই কবি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের মতো বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, যা বিশদভাবে অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে, রাবীন্দ্রিক ভাষ্যে হিন্দু-সমাজের চূড়ান্ত রক্ষণশীলতা (যা কবির ভাষায়

'পাপ' বলে চিহ্নিত), হিন্দু-মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানের পশ্চাদবর্তীতা এবং জাতীয়তার খণ্ডিত-চেতনা ইংরেজের ভেদবুদ্ধির সফলতার কারণ। তাই "শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।" অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেমের শক্তিতে ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে, হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক দূরত্ব জরুরী ভিত্তিতে দূর করতে হবে। কারণ, কবির চিন্তায় আর্থিক ও সামাজিক সাম্যই হৃদয়ের ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম। তাই অন্যকে দোষারোপ যেমন নয়, তেমনি

> "আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে।"(৯)

শুধু তাই নয়। প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের মত তিনি তাঁর আপন মানবিকতা-নিষিক্ত ধ্যান ধারণার প্রেক্ষিতে সমাধানের উপায় হিসাবে একটি বক্তব্য ও ব্যবস্থাপত্র তুলে ধরলেন দেশের, দশের ও রাজনীতিবিদ গণের সামনে। তাঁর কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো দেশের সম্প্রদায়গত বৈষম্যের অবসান (যা সময়-সাপেক্ষ বিষয়) ঘটানোর মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তির বিভেদ দূর করা এবং বিদেশী শাসন-শোষণ অবসানের একটি সামগ্রিক ও বাস্তবোচিত ভিত্তি নির্মাণ করা, যা সামান্য আঘাতেই বিনষ্ট হবেনা। শুধুমাত্র ইংরেজ বিদ্বেষের ঐক্য, কবির চিন্তায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, ঠুনকো জিনিষ, তা মোটেই কোনো ইতিবাচক আদর্শের বা বাস্তবভিত্তির উপর স্থিত নয়ঃ

> "কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া এক মনে এক প্রাণে এক স্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।
>
> "একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, (অর্থাৎ) ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনই কৃত্রিম সূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবেনা, রক্ত পিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকিব।"(১০)

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে জোড়াতালির মেলবন্ধন ও সংক্ষিপ্ত পথগ্রহণের রক্তাক্ত পরিণতি তথা তাঁর আশংকার ভয়াল বাস্তবায়ন দেখে যেতে তাঁকে

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয়নি। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ (ব্যাপক অর্থে) না করেও এই চিন্তাবিদ সমস্যার গভীরে স্বচ্ছ দৃষ্টি চালনা করতে পেরেছিলেন বলেই নেতির পথের পরিবর্তে ইতিবাচক পথে সমাধানের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তাঁর মতে সমাধানের পথ, দেশের সমগ্র জনশক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে আন্তরিকতা, শ্রম, ঔদার্য ও সংস্কার-মুক্ত কল্যাণী মানসিকতার হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া ঃ

> “সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদার করিয়া এত দূর বিস্তৃত করো যে দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয় চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমরা জয়ী হইবই। কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি চালনার সমস্ত পথ এক একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।”(১০)

কার্যসিদ্ধির পথ হলো কর্মশক্তিকে বৃহত্তর জনমানসের ঐক্যে কেন্দ্রীভূত করা, যার মধ্য থেকে **উৎসারিত হবে শক্তিচালনার পথ, সাফল্যের পথ ;** আর এ পথ ঐক্যবদ্ধ কর্মের ও আন্তরিকতার পথ, আত্মশক্তির তথা আত্মনির্ভরতার পথ ঃ

> “এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে এক বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব, তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব। তাঁহাদিগকে কর দান করিব ; নির্বিচারে তাহাদের শাসন মানিয়া চলিব।
>
> “আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্ত সহজ, যাহাতে দুঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিক গণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেননা। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, সেজন্যই আমি বিরক্তি ও বিদ্রূপ উদ্রেকের আশংকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং আশ্বস্ত করিবার একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।”(৯)

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রুশ সরকারের অধীনস্থ বাহলীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিদের জাতীয়তাবাদী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গোপন আদালত,

বিচার ব্যবস্থা ও কর্মসূচীর উল্লেখ করেছেন। কবির এইসব চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচী যত বাস্তব-ধর্মীই হউক না কেন দেশের রাজনৈতিক বৃত্তে উপেক্ষিত হবার ফলে জনসাধারণ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। অংশতঃ এই সূত্র পথেই অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক ব্যর্থতার (প্রবল আন্তরিকতা সত্ত্বেও) নিহিত কারণটি দেখতে পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, কবি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত 'কর্তৃসভা'র অধীনে দেশের শিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের কাজে লাগাতে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটিকে যথাযথ তাৎপর্যে সমাধানের পথে নিয়ে যেতে, গ্রামীন জনতার মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে, এবং সর্বোপরি বাংলাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর জনসমাজে স্বাদেশিকতার মূল মন্ত্র পৌঁছে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের বৃহত্তর আম-জনতার সচেতন-ঐক্যই যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রধান সর্ত, একথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বহুবার উল্লেখ করেছেন ; এবং একাজে মাতৃভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব রূপে তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছে ঃ

> “পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।”(১১)

কবির বক্তব্য ঃ 'যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি, তাদেরই নির্বাক হৃদয়ের গোপন স্তরে রয়েছে খনি'—যেখানে অবতরণ একান্ত ও আশু প্রয়োজন। জনসাধারণের সাথে চেতনার সেতুবন্ধন সম্পন্ন করবার অভিপ্রায়ে তিনি কংগ্রেসের সম্মেলন গুলোতে (রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা ইত্যাদি) বাংলাভাষা ব্যবহারের পক্ষে প্রবল অভিমত প্রকাশ করেন, যার ফলে উমেশ ব্যানার্জি প্রমুখ উচ্চতলার কংগ্রেসী নেতাদের কাছ থেকেও আসে বিদ্রূপ। অথচ এসব সম্মেলনে বিদেশী ভাষার ব্যবহার যে কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছেই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ঠেকবে। কবির ভাষায় “এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত ,অথচ ইহার ভাষা বিদেশী।” (১১)

আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করা এবং তার সার্থক পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের সর্ত হিসাবে দেশের বৃহত্তর পরিধিতে

আত্মশক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'আত্মশক্তি'র উদ্‌বোধন বলতে কবি জনশক্তির সাধনাই বুঝেছেন, এবং বোঝাতে চেয়েছেন ; অধ্যাত্ম শক্তির সাধনা নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি তুলে ধরেছিলেন সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের একটি নিটোল রূপরেখা, যা দেশের বৃহত্তর সমাজকেও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করবে। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর ১৯০৭ সালে তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন যে স্বরাজ আকাশ কুসুম নয়, একটি বাস্তব কর্মসূচীর মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে (ব্যাধি ও প্রতিকার) এবং একই সঙ্গে সুরাট কংগ্রেসের নরম গরমের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব উপলক্ষে স্পষ্টতই বলেন যে কংগ্রেসকে বাঁচাতে হলে মঞ্চ অধিকারের চেষ্টা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে প্রতিটি ঘরে গিয়ে জনসাধারণকে স্বাদেশিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে (যজ্ঞভঙ্গ : ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৮)। ষোল বছর পরেও তিনি এই একই পথকে সমাধানের উপায় রূপে চিহ্নিত করেছেন :

> "আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়।"(১২)

আর এই কাজে তিনি "জ্ঞান ও শক্তি সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সর্বসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্যাপ্ত" করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চেয়ে বিষয়টির অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বহিরঙ্গে জৌলুশ এবং অন্তরে সার্বিক বোধের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিলো। প্রসঙ্গতঃ তিনি দেশের যুবশক্তি, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন রাজনৈতিক শক্তির কাছে আবেদন রেখেছিলেন, বাঙলাভাষা ও বাঙালীর ইতিহাস, সমাজ ও ঐতিহ্যের সাথে নিজেদের গভীর ভাবে পরিচিত করে তুলতে ; নিজেকে চেনা ও জানার মাধ্যমে সচেতন বোধ গড়ে তুলতে। এখানে আমরা রাবীন্দ্রিক বাঙালীয়ানার আরেকটি রূপ প্রত্যক্ষ করি। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে উপর্যুক্ত "সর্বজন" উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বিত প্রতীকে ধৃত। এবং এই সমন্বিত সমাধানের পথই ছিলো তাঁর পূর্বাপর কাম্য।

আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ও আত্মনির্ভরতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার আরো একটি দিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমরা জানি, ইংরেজ শাসনে এদেশে আধুনিক শিক্ষা ও নব্য চিন্তাভাবনার আবির্ভাব তথা নব সংস্কৃতি'র নির্মাণ সীমিত অর্থে প্রগতিশীলতায় চিহ্নিত হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথও তাই জানতেন ; এমনকি এদিকটা তিনি বেশী করেই অনুভব

করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই খণ্ডিত সত্যের অন্ধকার উল্টো দিক সম্পর্কেও তার উদ্বেগ ও শংকা ছিলো প্রবল। কারণ ইংরেজ-সৃষ্ট এই শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজনটা একদিকে যেমন ছিলো সীমিত, অন্যদিকে তেমনি ছিল উদ্দেশ্যমূলক, যাতে সাম্রাজ্য-পরিচালনার উপযোগী বশংবদ আমলাতন্ত্র ও মেরুদণ্ডহীন কেরানীকুল সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া ইংরেজ নিজ স্বার্থেই সেই শিক্ষাকে দুর্লভ ও দুর্মূল্য করে তুলেছিলো যাতে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ সেই শিক্ষার নাগাল না পায়। স্বভাবতঃই সমাজের বিরাট অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার ফলে শুধু যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানটা সংখ্যার দিক থেকে বেড়ে যাবে তাই নয়, সামাজিক রক্ষণশীলতা ও অন্ধতার পাথর স্বরাজের পথটাকে নিঃসন্দেহে করে তুলবে দুর্গম। রবীন্দ্রনাথের চোখে বিষয়টি তার যথার্থ স্বরূপ নিয়েই পরিস্ফুট হয়েছিলো ঃ

> "আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র কেবল ধনের অভাব নহে তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব।...
>
> "বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী ?"(১৩)

শাসক তাদের শাসন-নীতির অনুকূল রূপেই শিক্ষার ব্যবস্থা করবে যাতে রাজভক্তির ছাঁচে শিক্ষিত-মানস গড়ে ওঠে, আর শাসকের অমিয়-বাণী উপদেশের স্রোত রূপে অবিরল বইতে পারে ঃ

> "হে অক্ষম, হে অকর্মণ্য, তোমরা রাজভক্ত হও ; তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোল যুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না।"(১৩)

অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান নিজেদের হাতে তুলে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেরাই গ্রহণ করা, যাতে শিক্ষার আদর্শ কেরানী ও আমলা তৈরিতে সমর্পিত না হয়, বরং যাতে করে স্বাধীনচেতা, পরিশ্রমী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরি হয়, যাদের মধ্যে স্বদেশচেতনার দীপ্তি অম্লান জেগে থাকবে ঃ

> "আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক যে গবর্মেন্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না? আমরা মনিবকে খুশী করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি—এই চাকরি আরো বিস্তার করিতে হইবে?...আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে।"(৯)

স্বাধীনচেতা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিলো, দেশের মানুষ সত্যিকার শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করবে। তাই কবি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন: 'ভিখ্ আমরা চাইনা। যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারা করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জনের দ্বারা পাইব।' এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই:

> "যাহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘন ঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে দলের লোক নই, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য।'(১৪)

এ প্রসঙ্গে কবি জাতীয়-নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি ও বিচক্ষণতার অভাব সম্পর্কে সখেদে আলোচনা করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক সমস্যাবলীতে ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই তাঁর চিন্তা বিজড়িত রেখেছেন সমাধানের পথ খুঁজে পাবার উদ্দেশ্যে, বলা বাহুল্য তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আলোয়।

পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান-কল্পে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিমালয় থেকে সুন্দরবন নয় শুধু, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিলো তখন অনেকেরই প্রত্যাশা ছিলো রবীন্দ্রনাথ নিজেকে গোঁড়া জাতীয়তাবাদের কক্ষে সমর্পণ করবেন। কিন্তু আত্মসচেতন রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার প্রশ্নে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রোতে অন্ধ ভাবে ভেসে যেতে পারেননি। এর প্রধান কারণ মত ও পথের পার্থক্য। তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ঊর্ধমুখীনতা, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা। এ কারণেই মহাত্মা গান্ধীর প্রশংসায় সোচ্চার হয়েও তিনি চরকা, খদ্দর, কাপড় পোড়ানো প্রভৃতি নীতির সাথে একমত হতে পারেননি, বিশেষতঃ চরকা-নির্ভর স্বরাজের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। এজন্য বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে অনেক

সমালোচনা, নিন্দা, এমন কি কটূক্তি পর্যন্ত বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিকই চরকা-নীতিতে দেশের স্বরাজ-কামী শক্তির অঙ্গহানির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। চরকা সম্বন্ধে তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে ঃ

> “আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
>
> “দেশের কল্যাণ সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়।”(১৫)

কারণ, যে মানুষ চরকায় স্বরাজ-সাধনা সমর্পণ করছে, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রাচীন চরকার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছে। তাতে কূপমণ্ডূকতার আদর্শ সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র ঃ

> “চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়। কংগ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন, তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্স্-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন, চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই।”(১৫)

তাই স্বরাজের পথে চরকার আবির্ভাবের অর্থ তাঁর ভাষায় ‘মানব ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস, দেশের লোকের ‘পরে অশ্রদ্ধা।’ কারণ, এই সময়-শ্রম-শক্তি অন্যত্র স্থায়ী উপকারে আসতে পারে, যেমন

> “বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়।”(১৫)

বিলাতি কাপড় পোড়ানোর ব্যাপারেও তার সহজাত চেতনার গভীরতা লক্ষ্যনীয়। তাঁর বুঝতে বাকি ছিলোনা যে হৃদয়াবেগের উত্তেজনায় শুধু কাপড় পুড়বে সচ্ছল-বিত্তবানদের আত্মপ্রসাদ ও সম্ভ্রম বাড়াতে, বস্ত্রহীনদের দুর্দশা বাড়িয়ে তুলতে এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের মুনাফার অংক বাড়িয়ে তুলতে। এবং এতে করে বিদেশী প্রাসাদের একটি ইটও খসে পড়বে না। তাই রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য-বিচক্ষণতায় এই কাপড় পোড়ানোর স্বপক্ষে অর্থ-

নৈতিক তাৎপর্য বুঝতে চাইলেন :

> "কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিক তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ সম্বন্ধে তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কহিতে হবে।
>
> "বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড়-পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে।"(৩)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নেতিবাচক কোন কর্মসূচীর পক্ষপাতি ছিলেন না। তা ছাড়াও এই কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি তাকে উদ্বিঘ্ন করেছিলো, বিশেষ করে বয়কট, বিলাতি বর্জন প্রভৃতি প্রশ্নে বাঙালী মুসলমানের অসহযোগিতার বিষয়টি তাঁর কাছে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিলো। তাই এ সম্পর্কে কবির নিরীক্ষা প্রণিধানযোগ্য :

> "মনের ক্ষোভে বাঙালী সেদিন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল।...
>
> "দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুতঃ দেশবাসীর মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই, ও কাপড় আমি পোড়াবার কে?...যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগ দুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না।"(৩)

বাস্তবিক দেশী মিল-ওয়ালারা কবির ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে নির্মম ভাবে কাপড়ের দর বাড়িয়ে বিত্তহীন জনমানসের দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছিলো, তার সেই সঙ্গে ফেঁপে উঠেছিলো তাদের মুনাফার অংক, প্রধানতঃ স্বাদেশিক কর্মসূচীর কল্যাণে। অথচ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এতবড় একটা গুরুতর বিষয়ের অর্থনৈতিক দিকটা একেবারে উপেক্ষা করে গেলো। সেকি তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার খাতিরে? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট, বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি প্রশ্নে বাংলার বৃহত্তর সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের অনীহা ও অসহযোগিতার কারণ সম্পর্কে কবির বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় চিহ্নিত। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও তাঁর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত কোন বিশেষ মতাদর্শ-জারিত নয়, বরং তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তায় আলোকিত।

স্বাদেশিকতার প্রশ্নে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদ

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ -মানসিকতার বিষয়টি বহুল-প্রচারিত। সন্দেহ নেই, দেশের যুবশক্তির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যে ব্যাপকতা দেখা গিয়েছিলো, তত্ত্বগত কিংবা পদ্ধতিগত কোনদিক বিচারেই কবি তার সমর্থন করেননি। রবীন্দ্র-চেতনায় মানব-ধর্ম ও মানবিকতার যে সম্পৃক্ত অবস্থান, তাতে একথা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা যে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসবাদ সমর্থন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। লক্ষ্যই শুধু বড় নয়, কবির কাছে পদ্ধতির প্রশ্নটিও বড়। তাই ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে বোমা-নিক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলার মৃত্যু ও অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে ও শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, অন্যায়ের পথ তা যত সংক্ষিপ্তই হউক না কেন, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথ নয়, এবং কার্যতঃ তা কোন মহৎ লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হয়না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, কিছু সংখ্যক গুপ্তহত্যা সামগ্রিক ভাবে দেশের জন্য কোন সুফল ডেকে আনবেনা, বিশেষত ঃ দেশের বিশাল প্রাণশক্তির সাথে যদি তাদের গভীর সংযোগ স্থাপিত না হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন সাধারণ মানুষের চোখে এইসব আত্মত্যাগী বীর তরুণদের পরিচয় ছিলো 'স্বদেশী ডাকাত' রূপে, এবং দেশের আম-জনতার সাথে তাদের সংযোগ খুব একটা নিবিড় ছিলোনা। বলা বাহুল্য, পদ্ধতি হিসাবে সন্ত্রাসবাদ মার্কসবাদ সম্মতও নয় এবং পরবর্তী কালে জেলে বা আন্দামানে আটক এই সব সন্ত্রাসবাদীদের একটা বিরাট অংশ মার্কসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো। প্রসঙ্গতঃ স্বদেশমুক্তির প্রশ্নে ব্যষ্টি বনাম সমষ্টির বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে রাবীন্দ্রিক বক্তব্যের বিচক্ষণতা বিস্ময়কর ঃ

> "সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গের দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন। তাদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। আমার মনে হয়, তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিষ সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি।"(৩)

কিন্তু মত ও পথের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এইসব তরুণদের দেশপ্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগ অনেক সচেতন শিক্ষিত মানুষের মতো কবির কাছেও পরম মমতায় স্বীকৃত ঃ

> "মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয় -বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজ-সম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমান হীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না। তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চশিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই।"(১৬)

মতভেদ সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী যুবকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। এর কারণ তরুণদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। এমন কি এদের প্রতি সরকারী, বিশেষতঃ পুলিশী-নির্যাতন সম্পর্কেও কবি সোচ্চার :

> "দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিশের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি।"(১৬)

আবার অন্যদিকে 'চারঅধ্যায়' উপন্যাসে বিপ্লবীদের দেশোদ্ধারের প্রয়োজনে অনাথা বিধবার প্রাণের বিনিময়ে তার সর্বস্ব লুণ্ঠনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নায়ক অতীনের আত্মগ্লানিতে (তার ভাষায় স্বভাবধর্মের বিচ্যুতি) যে বক্তব্য পরিবেশিত, রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাবলীতেও অনুরূপ মতামত পরিস্ফুট ; অর্থাৎ অন্যায়ের পথে মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়না। তবে এটাই উপন্যাসের প্রধান বা শেষ কথা নয়। কারণ বিপ্লবের ঝড়-বাদলের পটভূমিতে উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য এলা-অতীনের প্রেমের ট্রাজেডি, এর পরিণতি যেমন ঘটনাসিদ্ধ, তেমনি চরিত্রানুগ—এর বাইরে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিলোনা তাদের জন্যে। বিশেষ করে উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে যারা বিশেষভাবে পরিচিত, তারা বিষয়টি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। কারণ, দেশোদ্ধারের জ্বলন্ত ব্রতে সুরূপা সুতপাদের অনুপ্রবেশ যেমন ছিলো খাঁটি, তেমনি তার ফলশ্রুতিতে অগ্নিচক্রে ভাঙ্গন ধরার দৃষ্টান্তও ছিল ততোধিক বাস্তব। আর একথাও সত্য যে সাময়িক উদ্দামতায় এই অগ্নিচক্রে প্রবেশ করে বহু মূল্যবান জীবন ও প্রতিভার

অকাল-বিনাশ ঘটেছে—কখনো ঘটনার অঘটনে, কখনো বিচ্যুতি বা স্খলনের পথে। এ কোন তাত্ত্বিক উপস্থাপনা নয়, পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদারের হাতে এ জাতীয় ঘটনা ও দৃষ্টান্তের বাস্তবধর্মী উল্লেখ বহুল পরিচিত। তবু সমকালীন পরিবেশ বিবেচনায় রাজনৈতিক চিন্তা বা সূত্রের বাস্তবিকতা রূপায়ণে উপন্যাসের মাধ্যম ব্যবহার না করে তাঁর বক্তব্য প্রবন্ধাবলীতে সীমাবদ্ধ রাখলেই ভালো হতো। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে মত ও পথের ভ্রান্তি সত্ত্বেও বিপ্লববাদের প্রচেষ্টায় উজ্জ্বল প্রাণের বিসর্জন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে পরোক্ষে হলেও প্রবল আঘাত হেনেছিলো, যার সুফল আহরণ করেছে প্রকৃতপক্ষে আপোষবাদী জাতীয়-আন্দোলনের নেতৃত্ব।

যে কারণে এবং যে মানসিকতার বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ গুপ্তহত্যার হিংসা-পিচ্ছিল পথ স্বাদেশিকতার কারণেও সমর্থন করেননি, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ তিনি এই সন্ত্রাসবাদী তরুণসমাজের উপর রাজসরকারের নির্যাতন নীতির নিন্দা করেছেন এবং মানবিকতার বোধে উদ্বেল হয়ে তাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও মমতা উৎসর্গ করেছেন। কেউ কেউ মনে কয়েন, রবীন্দ্রনাথ 'বদনাম' গল্পে সদুচরিত্রের বলিষ্ঠতায় সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণার বদনাম অনেকাংশে ঘুচিয়েছেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাজনীতিচিন্তা সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা সর্বাংশে সঠিক নয়। কারণ, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধাবলীতে সুস্পষ্ট। দেশপ্রেমের সেই ঝড়ো হাওয়ার যুগেও কবির প্রত্যাশা ছিলো যে এই প্রচণ্ড যাত্রার লক্ষ্য হবে এদেশ থেকে অন্ধ, মানবতা-বিরোধী আচার-সর্বস্বতা বলিষ্ঠ হাতে দূর করে মানব-ধর্মের ভিত্তিতে দেশের লোকদের এক সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড় করানো, যাতে অনৈক্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সে প্রত্যাশা বা স্বপ্ন সফল হয়নি।

কিন্তু সন্ত্রাসবাদী নীতি অসমর্থনের অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ এদেশে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতায় নির্বাক ছিলেন বা নীরব-ভূমিকা পালন করেছেন। চিন্তা ও কার্যক্রমে কিছুটা স্ববিরোধ (অর্থাৎ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ-নির্যাতনের রূপ উপলব্ধি সত্ত্বেও রক্তঝরা সংগ্রামী পথের সমর্থক ছিলেন না) সত্ত্বেও মানবধর্ম ও মানবিকতা ধর্ষিত হতে দেখলেই সুস্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। যে-কোনো প্রকার অন্যায়ের সমর্থনই তাঁর মানসিকতা-বিরোধী ছিলো। তাই দেখা যায়, মানবতাবাদী, শান্তিকামী কবির কঠিন অভিব্যক্তি ইংরেজের প্রতি,

তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ভূমিকার প্রতি। বিদেশী শাসনের সর্বপ্রকার বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার ও অকুতোভয় ছিলেন কবি। আমরা জানি, ইংরেজের এদেশে শিক্ষা-সভ্যতা আধুনিক ধ্যান-ধারণার প্রকাশ ঘটানো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা মোহ ছিলো, যা যৌবনে ইংরেজী সাহিত্য ও মনীষীদের সাথে পরিচিত হবার ফল ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, যে সম্পর্কে 'সভ্যতার সংকট'-এ তিনি নিদারুণ ভাবে মুখোশ খোলার কাজটি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো প্রকৃতপক্ষে অনেক আগেই, এক একটি করে শাসক-ইংরেজের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জনে, আর সম্ভবতঃ অবচেতনে উপস্থিত ছিলো প্রথম থেকেই—তাই এ বিষয়ে পূর্বাপর আত্মবিরোধ তথা অন্তর্দ্বন্দ্বের জের টেনে চলতে হয়েছে তাঁকে, কখনো সজ্ঞানে, কখনো অবচেতনের প্রেরণায়।

তাই ১৯১৭ সালেই তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে স্বাধিকারপ্রমত্তঃ এই ইংরেজ-শাসন এদেশকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারেনা, গ্রহণ করেছিলো আর্য, পাঠান-মুঘল প্রভৃতি বৈদেশিক আগন্তুকের দল। অবশ্য আর্য অভিযানের পর প্রকৃত মিলনক্ষেত্র তৈরী হয়েছিলো অনার্যদের সাথে অনেক পরে, যখন আর্য-সাধকদল 'সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি' ও প্রচার শুরু করলো হৃদয়ের মনীষা সম্বল করে। বৌদ্ধযুগের অশোক এমনি এক দৃষ্টান্ত। মুসলমান যুগেও আগন্তুকের স্বার্থ আর এদেশের স্বার্থ এক হয়েছিলো, সে স্বার্থ সাগর-পাড়ি দিতে শেখেনি, চায়নি। তাই মুঘল সম্রাট আকবর শুধু বিশাল "রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা" করেছিলেন, যাতে সারাদেশ এক স্বার্থের বৃত্তে বাঁধা পড়ে। সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের এই সব পথ ধরেই কয়েক শতাব্দি জুড়ে হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফি'র অভ্যুদয় ঘটেছিল, যারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলন ক্ষেত্রে একেশ্বরের মহিমা প্রচার করেছিলেন সব বিভেদ, সব অনৈক্য দূর করতে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সমন্বয়ন ও সাযুজ্যের আদর্শ ভারতের সম্পদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষা-বিজ্ঞানের দীপ হাতে ইংরেজের আগমন সম্পর্কেও এই প্রত্যাশা ছিলো। কিন্তু বাস্তব সত্য অনেক ক্ষয়ের বিনিময়ে ভিন্নতর সত্যের মুখোমুখি করে ফেললো তাঁকে ঃ

> "অনেকদিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতি সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙ্গিবার সময় আসিয়াছে।...
> "ইংরেজ এখন বলিতেছে, যাহা তরবারি দিয়া জয় করিয়াছি তাহা তরবারি

> দিয়া রক্ষা করিব।...ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজত্ব পাইয়া অবধি ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্যে দীক্ষিত করিয়াছে, আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণ সমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মতো নিমগ্ন হইয়াছে।"(৭)

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ইংরেজের এই উপনিবেশধর্মী শোষণের আদর্শ পশ্চিমী দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের ফলশ্রুতি ; ইউরোপীয় সভ্যতার মশালটির কাজ আলো দেখানো নয় শুধু, আগুন-লাগানো। দেশের সমৃদ্ধি বাড়াতে তাই প্রয়োজন হয় উপনিবেশ সৃষ্টির এবং নির্বিচার শোষণের ঃ

> "তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত, তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সবচেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে।"(১৭)

অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের দস্যুবৃত্তি, অমানবিক শোষণ-শাসন আর অস্পষ্ট রইলোনা। স্বভাবতঃই 'সাহিত্যে পুঁথিতে, ইতিহাসে' চেনা বড়ো ইংরেজের মহত্ত্ব আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের গভীর কালাপানিতে কূল পায়না, তল পায়না। চোখের সামনে ঝলসে ওঠে অনেক ভয়াল দৃশ্যের মধ্যে "জালিনওয়ালাবাগের বিভীষিকা"। এই শাসক ইংরেজের সঙ্গে কি চলতে পারে আপোষ ? প্রসঙ্গতঃ একটি প্রশ্ন চকিতে ভেসে ওঠে ঃ নির্বিচারে, নির্দ্বিধায় কি গ্রহণ করা চলে জাতীয়তাবাদকে, তা সে দেশেই হউক আর বিদেশেই হউক, বিশেষ করে অভিজ্ঞতা যখন শুধু বিষ আর রক্তে একাকার ?

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বিশদভাবে দেখতে পাবো বিশ্বজুড়ে উগ্র-জাতীয়তাবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও মতামত। কিন্তু স্বদেশের সীমানায় দেখা যাচ্ছে যে কবি ইংরেজ তথা বড়ো-ইংরেজ সম্পর্কে, ইংরেজী সভ্যতা সম্পর্কে মোহ কাটিয়ে উঠছেন ক্রমশঃ ; প্রতিবাদ নয় শুধু, ধিক্কার ঝলসে উঠছে তাঁর লেখায়, বক্তৃতায়, কার্যক্রমে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে এই মানসিকতার বিকাশ প্রথম মহাযুদ্ধশেষে বা জালিনওয়ালাবাগের বর্বরতা থেকেই শুরু হয়নি, **এর প্রকাশ আত্মশক্তির ধ্যানধারণা বিকাশের কাল থেকেই।** তাই ১৯০২ সালেই দেখতে পাই বিদেশী শাসকের নকল জাকজমকের প্রতি সরস, সুতীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝলসানি, বিশেষ করে সে আড়ম্বর যখন

উপনিবেশের রক্তহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কার্জনের আয়োজিত দিল্লীর দরবার সম্পর্কে কবির মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট :

> “ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্যোগ হল। তখন রাজ্যশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। আমি বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিষটা প্রাচ্য—পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটেকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটা নয়।...ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে, কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্র নেই।”(১৮)

ইংরেজ-বণিকের উপনিবেশী চরিত্রের সাথে মুঘল রাজচরিত্রের স্বদেশীয়ানার তুলনামূলক বিচারে একাধারে সরস ও বিষণ্ণ রেশ সৃষ্টি করেছেন কবি :

> “প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেক সময়ই তাহাদের স্বভাবের ঔদার্য। দিলশ্বরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিন নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।...ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজ্যের বিপুল শাসনকার্য জনসমাজের হৃদয়ের দিকে নহে।...এদিকে হিসাব-কিতাব এবং দোকানদারির টুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্য সম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা এই দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশী হইবেনা, যাহাও হইবে, তাহার অর্ধেক আদায় করিয়া লইতে পারিব।”(৭)

অথচ মধ্যযুগের দিল্লী-দরবারের প্রকৃতি ও আকৃতি ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র :

> “মুসলমান সম্রাট যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসন মাত্র ছিলোনা। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মান ভাজন ছিলেন।...প্রাচ্যসম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র শিল্পশোভা আনন্দ উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারি দিকে প্রজার ঘরে পড়িত—তাহাদের তোরণ দ্বারে যে নহবত বসিত তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটিরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।”(৭)

সম্ভবতঃ পাঠক এ ভুল করবেন না যে রবীন্দ্রনাথ রাজতন্ত্রের কড়া সমর্থক। কারণ, বিষয়টি স্বদেশী শাসন বনাম বিদেশী-শাসনের প্রেক্ষিত। মুঘল পাঠান এদেশের মাটিতে আপন বিদেশীয়ানা হারিয়ে স্থানিক হয়ে ওঠেছিলো;

কিন্তু ইংরেজ তার আধুনিক উপনিবেশিক চরিত্রের জন্য বিদেশীই রয়ে গেলো। এই বিদেশী ইংরেজের দমননীতির বিরুদ্ধে বরাবরই সোচ্চার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে নির্ভীক যোদ্ধার মতো এগিয়ে গেছেন কবি। ১৮৯৪ সালে যেমন ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয় হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি, (১৯) তেমনি নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন সিডিশন বিলের বিরুদ্ধে (২০) প্রবন্ধ পড়তে টাউনহলে (১৮৯৮ সালে)। সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের ঘাতকের ভূমিকাও সমান নির্দ্বিধায় উদ্ঘাটিত করে দিলেন (১৮৯৩ খৃঃ)। শুধু তাই নয়, সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণটিও তুলে ধরলেন একই সঙ্গে মুৎসুদ্দি শ্রেণীর চরিত্র নির্দেশে ঃ

> "১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। এদিকে পথের মধ্যে পুলিশ তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবমেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।...সাঁওতাল উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙামাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজ-রাজ হতভাগ্য বন্যদের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন।"(২১)

এমনি করে একের পর এক এদেশে ইংরেজ শাসকের উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে চললেন, যার ফলে এদেশে ন্যায়ের কণ্ঠরোধে, স্বাদেশিকতা দমনের নিষ্ঠুরতায়, এবং সর্বপ্রকার দমন ও শোষণ নীতির রূপায়ণে ইংরেজের ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, পরিস্ফুট হলো সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ রক্ষায় ফ্যাসিবাদী ভূমিকা। আত্মশক্তি ,রাজাপ্রজা, সমূহ, ভারতবর্ষ, স্বদেশ প্রভৃতি সিরিজের প্রবন্ধাবলী সাধনায়, ভারতীতে ও বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটাতে লাগলো। এদেশীয়দের প্রাণের মূল্য যে শাসক শ্বেতাঙ্গদের কাছে কানাকড়িরও কম, এই ঘাতক মনোবৃত্তির ফ্যাসিবাদী প্রকাশকে তীব্রভাষায় অভিযুক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি রবীন্দ্রনাথ ঃ

> "ইংরেজ কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, এবং ইংরেজের আদালতে সেই সকল হত্যাকান্ডে একজন ইংরাজের দোষও সপ্রমাণ হয় নাই।"(১৯)

শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের শিকার এদেশের মানুষ ঃ

> "ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো, সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণ দান করা ; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া।"(২২)

এমনি করে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী লিখে আপন মতামত সরাসরি ব্যক্ত করেছেন তাই নয়, রাজনীতিচর্চার পরও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যায় নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করে নিশ্চল থাকতে পারেননি, অথচ বিশের প্রথম কয়েক দশকে একমাত্র বিদ্রোহী নজরুল ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যিককে আমরা দেখতে পাই না প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হতে বা অংশ গ্রহণ করতে।

প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সার্বিক সমর্থক না হয়েও রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রায়শঃই আপন সংশ্লিষ্টতা বজায় রেখেছেন। পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা প্রভৃতি প্রাদেশিক সম্মেলন গুলোতে জাতীয়তাবাদী মঞ্চে যেমন আপন বক্তব্য রেখেছেন, তেমনি কংগ্রেসের নরম-গরমের মতবিরোধের মধ্যস্থতায়, ত্রিপুরী কংগ্রেসে বাম-বাংলার প্রতীক সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে, বঙ্গভঙ্গ অসহযোগ বয়কট প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রশ্নে মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে কংগ্রেস-নেতৃত্বের অবহিত হওয়ার জন্য উপদেশে প্রভৃতি বিচিত্র সমস্যায় রবীন্দ্রনাথ বারবার নিজেকে রাজনীতির অঙ্গনে এনে দাঁড় করিয়েছেন। বিশের প্রথম দশকে তাঁর কবিতায় অস্পষ্টতা ও সৌন্দর্যবাদ তথা ভাববাদিতার অভিযোগ বারবার উত্থাপিত হয়ে থাকে, কিন্তু তখনো দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীতে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায়ই মুদ্রাযন্ত্র আইন, দমননীতি, কণ্ঠরোধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে শাসক-রাজের প্রতি বিরোধিতায় ও প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ, এবং সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং উগ্রজাতীয়তাবাদরূপী ফ্যাসিবাদের প্রতি বিরূপতায় ও নিন্দায় মুখর। আন্তর্জাতিক-চেতনায় এইসব প্রগতিমুখী ধারার অভিক্ষেপ এবং সাহিত্যের সীমানায় সৌন্দর্যতত্ত্ব অতিক্রম করে নির্যাতন ও সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠার বিস্তারিত তথ্য আমরা পরবর্তী সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দেখতে পাবো, এবং সেই সঙ্গে আরো দেখতে পাবো

ব্যক্তিস্বাধীনতা, শিক্ষা,কৃষক ও তার সমস্যা এবং ধনী-নির্ধনের সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি এবং বক্তব্য।

কিন্তু রাজনৈতিক উদ্যানে তিনি শুধু যে প্রবন্ধ লেখক ও প্রবন্ধ পাঠকের ভূমিকায় নেমেই সবটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন তাই নয়, প্রয়োজনে অসুস্থ শরীরেও অকুস্থলে হাজির হয়েছেন বা প্রত্যক্ষ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ-শেষে ইউরোপে রোলাঁ, বারবুস প্রমুখদের সঙ্গে 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম বিরোধী লীগের' পক্ষে হাত মিলিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি কবি, 'নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা ইউনিয়নে'র সভাপতি রূপে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনেরও শরিক হয়েছেন ; হাজার হাজার তরুণের বিনা বিচারে আটক প্রসঙ্গে চিঠি লিখেই কর্তব্য সমাপন করেননি। এ সময়ে (১৯১৭ সালে) শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ট ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আয়োজিত সভা টাউনহলে সরকারী নিষেধাজ্ঞার দরুণ অনুষ্ঠিত হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন্ লাইব্রেরির সভায় 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পড়ে এদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এ সম্পর্কে তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকার মন্তব্য চিত্তাকর্ষক :

> “যখন বঙ্গের গবর্ণর টাউনহলে শ্রীমতী বেসান্টের স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারি করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি 'রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ' রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরিতে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহবল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।”(২৩)

এ সম্পর্কে তৎকালীন জনশ্রুতি যে “এই জন্য তাঁহার গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল।” একমাত্র 'প্রবাসী'র নয়, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ :

> “...বক্তৃতার তাগিদ আসিল। দেখিলাম রাক্ষসটাকে যত প্রকাণ্ড প্রবল বলিয়া মনে হইত উহার জোর ততটা নয়। উহার আয়তন বড়ো, কিন্তু ভিতরটা ভুয়ো, একটু ধাক্কা মারিলেই দেখি টলমল করিয়া উঠে। সুতরাং যে পর্যন্ত না কাত হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারিবার সংকল্প রহিল।”(২৪)

এর পর ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ জালিনওয়ালাবাগে পশুশক্তির বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে লণ্ডন থেকে

এণ্ড্রুজকে লেখেন : "পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে যে ডায়ারের বিতর্ক হল, তার ফলে ভারতের প্রতি এদেশের শাসকবৃন্দের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে আমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে।...সেই নৃশংস অত্যাচারের যে নির্লজ্জ সমর্থন তাদের সংবাদপত্রে ও ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে, তা বিসদৃশ ও বিগর্হিত। ইংরেজের অধীনে থাকার অবমাননাবোধ গত পঞ্চাশ বছর কি তারও আগের থেকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে।...আশা করি আমার দেশবাসীরা নিরাশ না হয়ে দৃঢ়তা ও অপরাজেয় সাহসের সঙ্গে তাঁদের পূর্ণ শক্তি দেশের সেবায় লাগাবেন। যা ঘটে গেছে তাতেই প্রমাণ হয়েছে যে, আমাদের মুক্তি আমাদের নিজেদেরই হাতে।" অর্থাৎ শুধুমাত্র 'স্যার' উপাধি বর্জন করেই চুপচাপ বসে থাকেননি রবীন্দ্রনাথ। বলাবাহুল্য, এখানেও তাঁর বহু-কথিত 'আত্মশক্তি' উদ্বোধনের প্রশ্নটি যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যে শক্তি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতে, রাষ্ট্রশক্তি কব্জা করা সম্ভব নয়, বা সম্ভব হলেও তাকে সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় তার "কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে" হওয়া সত্ত্বেও হিজলি ও চট্টগ্রামের নৃশংস ঘটনাবলীর প্রতিবাদে গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের সভায় ১৯৩১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সভাপতি রূপে কবি তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও শাসক-বর্বরতার বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেন। এমন কি এ বিষয়ে 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি ছাপা না হলেও অন্যান্য ইংরেজি দৈনিকে তা পরে ছাপা হয়। হিজলি বন্দি হত্যা বিষয়টির একটু গভীরে যেতে চাইলে আরো কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক আমাদের চোখে ধরা পড়ে : এক, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ পন্থা হিসাবে সন্ত্রাসবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, আর হিজলি ক্যাম্পের বন্দিরা ছিলেন সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু তা সত্ত্বেও অসুস্থ শরীরে, বৃদ্ধ বয়সে প্রতিবাদ সভায় সামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দুই, সামিল হয়ে শুধু দায়মোচন নয়, কবির ইচ্ছানুসারে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সভার সংবাদের সঙ্গে আরেকটি বিজ্ঞাপনও ছিলো যে সেদিনের সভার বিবরণী ও কবির বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণসহ প্রকাশিত সান্ধ্য বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য হবে এক পয়সার বদলে দুই পয়সা। এবং বিক্রয়লব্ধ টাকার অর্ধেক হিজলি-চট্টগ্রাম রিলিফ ফাণ্ডের জন্য কবির হাতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ রাজনীতির তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সাথে

ঠিকই কাঁধ মিলাতে হলো কবিকে। তিন, 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার বিকৃত তথ্য পরিবেশন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি কারী ভূমিকার বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ। এবং প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের এই সভায় বক্তব্যের স্পষ্টতা ও তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে হিজলি-ক্যাম্পের অন্যান্য বন্দিগণ তাদের তেরোদিন ব্যাপী অনশন ধর্মঘট ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন।

শুধু হিজলি-চট্টগ্রাম নয়, অনুরূপ ভাবে আন্দামানে অনশনরত বন্দীদের মুক্তির অভিপ্রায়ে কলকাতা টাউন হলে (২রা আগষ্ট, ১৯৩৭) অনুষ্ঠিত জনসভায় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকা যেমন বলিষ্ঠ, তাঁর বক্তব্যও তেমনি সুস্পষ্ট :

> “...ন্যায় ও মানবতার আহ্বান আমরা স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারিনা, একমাত্র বাঙলাতেই শত শত বালক আজো বিনা বিচারে বন্দী। মুদ্রাযন্ত্রের উপর মাঝে মাঝে এমন আঘাত করা হয়, যাতে এমন একটি শক্তির কথাই মনে করাইয়া দেয়, যে-শক্তি জন সাধারণের বাসনার অনুকূল নয়।...
> “ভারতের শাসন-কর্তৃপক্ষ ফ্যাসিস্ট আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।
> “আমার দেশের নামে আমি এসবের প্রতিবাদ করিতেছি।”(২৫)

পরিশেষে কবি তৎকালীন বাঙলা সরকারের নিকট আবেদন জানান যাতে তারা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের সরকারের সাথে আলোচনা-ক্রমে রাজবন্দী মুক্তির প্রশ্নটি “সহানুভূতির ও উদার মানবিক দৃষ্টিতে” বিচার করেন। উল্লেখ্য যে, সে-সময় জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত অকংগ্রেসী কোয়ালিশান মন্ত্রীসভার উপর এ সম্পর্কে কংগ্রেসের রাজনৈতিক চাপের (ন্যায্য অথচ কৌশলী) মুখেও কবি তাঁর আহ্বানে স্বভাব-সুলভ উদার ও সহিষ্ণু মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি রাজনীতিকদের কূট চালের শিকার হননি বলেই পরবর্তী পর্যায়ে কিছু সংখ্যক রাজবন্দীর মুক্তি উপলক্ষে উদার কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন :

> “মুক্ত রাজবন্দীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে গিয়া বাঙালার মন্ত্রীমণ্ডলের বুদ্ধি সম্মত উদার কার্যের জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতে আমরা যেন বিস্মৃত না হই।”(২৬)

এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমস্যাকে মানবিক চেতনার মানদণ্ডে বিচার ও সমাধানের রৈবিক প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু এর পরও ২১·১·৩৮ তারিখে এবং পরবর্তীকালে রাজবন্দী-মুক্তির প্রশ্নে কবি নিজস্ব বক্তব্য

প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বিষয়টি বারবার সংশ্লিষ্ট মহলের সামনে তুলে ধরেছেন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং সুবিচারের প্রত্যাশায়।

শুধু স্বদেশের ঘটনাবলীতেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি পূর্বাপর বিচক্ষণ প্রগতির মানবিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। চীনের উপর ফ্যাসিস্ট জাপানের আগ্রাসন বহু বিষয়ের মধ্যে একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত, যে সব ক্ষেত্রে কবির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় কোনো অস্পষ্টতা নেই ঃ—

(ক) ভারতের জাতীয় স্বার্থে জাপান-বিরোধী কার্যকলাপ থেকে কংগ্রেস ও পণ্ডিত নেহেরুকে বিরত রাখার জন্য রাসবিহারী বসু জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে ব্যক্তিগত তারবার্তা পাঠান, তার জবাবে ১০ই অক্টোবর (১৯৩৭) কবি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীযুক্ত বসুকে লেখেন ঃ

> "...জাপান ও তার অভিনব জাগরণ আমাদের প্রবুদ্ধ আত্ম-চেতনাকে বিনষ্ট করিতে চলিয়াছে। তাহার শোষণ নীতির চেয়েও জঘন্য, তাহার পরদেশ গ্রাস করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাও কদর্য জাপানের বর্তমান তাণ্ডবলীলা।...চীন হইতে প্রত্যহ যে হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিতেছে, তাহা মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা।"(২৭)

(খ) জাপানী বর্বরতার বিরুদ্ধে (কবিতায়ই নয় শুধু) সংবাদপত্রে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে ক্যান্টনের বাণিজ্য সংঘের সভাপতি মিঃ ইংকিয়াং কবির বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লেখেন, এবং সেই সঙ্গে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে তাদের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।(২৮)

(গ) বিশ্বভারতী চীনাভবন থেকে জাপানী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এবং জাপানী পণ্য-বর্জন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।(২৮)

(ঘ) জাপানী আক্রমণ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে চীনা জনগণের উদ্দেশে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের যে ঘোষণা বেতার মারফত চীনে প্রচারিত হয়েছিলো, সেখানেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিশ্চিত পরাভবের উজ্জ্বল প্রত্যয় ঝলসে ওঠেছে ঃ

> "শক্তির হুংকার, নির্বিচারে প্রাণীহত্যা, শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস এবং মানব সভ্যতার সর্বপ্রকার আইন-কানুনের ব্যাভিচার এশিয়ার আধুনিক ভাবধারার অবমাননা করিয়াছে।...জাপান এমন এক অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যাহা আপাত-সাফল্য সত্ত্বেও ধূলায় লুটাইয়া পড়িতে এবং ব্যর্থ হইতে বাধ্য।"(২৯)

(ঙ) চীনে নির্বিচার, ব্যাপক বোমা-বর্ষণ, হত্যা ও বর্বরতার প্রতিবাদে ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে সারাভারতের বিভিন্ন স্থানে চীন দিবস প্রতিপালিত হয় এবং চীন-সাহায্যভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা চলে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে শুধু যে সাহায্য তহবিলে পাঁচশত টাকা জমা দেন (৩০) তাই নয় ; বিশ্বভারতীতে ১০ই জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে চীন দিবস পালনের সাথে সাথে চীনকে বাস্তব ও কার্যকরী সাহায্য দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রস্তাব গৃহিত হয়।(৩১)

স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থনেও দ্বিধাহীন এগিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। ফ্যাসিস্ট সমর নায়ক ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহী বাহিনীকে ইতালী ও জার্মানীর ফ্যাসিস্ট সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য দানের বিরুদ্ধে তৎকালীন পৃথিবীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার ভূমিকা সেসময় সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজে ঘৃণা ও ধিক্কারের ঝড় তুলেছিলো। আর সেই পটভূমিতেই জন্ম নিয়ে ছিলো বহুখ্যাত 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড'। বিদ্রোহীদের বর্বরতা ও ইতালী-জার্মাণীর সক্রিয় সহযোগিতার বিরুদ্ধে 'ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ-বিরোধীলীগের' সভাপতি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতিতে (৩·৩·৩৭) পরিস্ফুট :

> "আজ স্পেনে বিশ্ব-সভ্যতা অমানুষিক ভাবে পদদলিত হইতেছে। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিস্ট সংঘ বিদ্রোহীদের দলে দলে সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিতেছে।... মাদ্রিদে আজ আগুন জ্বলিতেছে।...হাসপাতাল ও শিশু-আশ্রম সমূহ-ও ইহাদের অমানুষিক নির্যাতনের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। রমণী ও শিশুদিগকে নির্বিচারে হত্যা করা হইতেছে।...
>
> "ফ্যাসিস্টদের এই প্রলয়ংকরী অভিযানের গতি প্রতিহত করিয়া বর্বরতার হাত হইতে মানব সভ্যতাকে যে কোন ভাবেই রক্ষা করিতে হইবে।...
>
> "স্পেনের এই সংকট মুহূর্তে স্পেনের জনসাধারণের সাহায্যে অগ্রসর হউন। জনগণ-প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সাহায্য করুন এবং সহস্রকণ্ঠে বিদ্রোহীদের কার্যের প্রতিবাদ করুন।"

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বর্বরতা নিরসনের জন্য শুধু মাত্র আদর্শবাদী, সুশ্রী বক্তব্য রেখেই ক্ষান্ত হননি রবীন্দ্রনাথ, জনগণের সাহায্যে সক্রিয় হস্ত প্রসারণের জন্য বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে প্রবল ও ব্যাপক রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে জারিত অই দশকে রবীন্দ্রনাথ শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজন সম্পর্কেও ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন যা নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত।

বোলপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম জেলা সম্মেলনে উপস্থিত কিষান-শ্রমিকের যে দলটি শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান, তাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য লক্ষ্যণীয় তাৎপর্যে নিষিক্ত :

> "রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইয়া মনে রাখিবে যে তোমরাই জাতির বল ও সামর্থ্য। কেবল বক্তৃতা শুনিয়া যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য নহে, তোমাদেরও অনেক কিছু বলিবার আছে। নেতাদের বলিও তাহারা যেন তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দেন। চিত্ত তোমাদের ভয়শূন্য হউক।"(৩২)

এরপর রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতি সম্পর্কে ভীত ও বিতৃষ্ণ রূপে চিহ্নিত করে দেওয়া কতটুকু সম্ভব ? এ ছাড়াও বছরের পর বছর রাজনৈতিক কর্মীদের বিনা বিচারে আটক বা অন্তরীণ রাখার এবং তাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এতটুকু দ্বিধা করেননি কবি (১৯৩৭)। তাঁর ভাষায় :

> "নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনো প্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যারা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তারা যদি করেন, আমি নিচে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদ করব।... দণ্ড প্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি।"(৩৩)

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধাবলী পাঠে আমরা দেখতে পাই, কেমন করে কবি ইংরাজ শাসনের ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে বিষয়ান্তরে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই বুঝতে কষ্ট হয় না যে 'সভ্যতার সংকট'-এ ব্যক্ত ধিক্কার মোহমুক্তির একটা বিচ্ছিন্ন অধ্যায়মাত্র নয়, যা অনেকে মনে করে থাকেন। প্রথম পর্বের 'আত্মশক্তি' থেকে আরম্ভ করে 'কালান্তর' পেরিয়ে 'সভ্যতার সংকট' নিঃসন্দেহে এক ক্রমবিবর্তনের রাজনৈতিক ইতিহাস, যে ইতিহাস আরো সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় তাঁর নাটক, উপন্যাস ও কবিতাংশে সুপরিস্ফুট, অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে আমরা তাঁর চৈতন্যের ঐসব কোণগুলো দেখতে চেষ্টা করবো, এমন কি তাঁর শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডেও তাঁর রাজনৈতিক ও সার্বিক ধ্যানধারণার পরিচয় নিতে পারবো।

বর্তমান পর্যায়ে অন্ততঃ এটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা যে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে ও কার্যক্রমে যে তথ্য ও তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে তাতে

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিচিন্তা, চর্চা ও সংশ্লিষ্টতার একটি রূপরেখা বিদ্যমান। এবং এটুকু নিঃসন্দেহে স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ তাৎক্ষণিক রাজনীতির সমস্যাগত দিকের চর্চা যেমন করেছেন, তেমনি প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো রাজনৈতিক বৃত্তে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা বোধকে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্বের লেবেলে যেমন চিহ্নিত করা যায়না তেমনি করা যায়না সেইসব ছকে ফেলে বিশ্লেষণ। বরং দেখা যায় তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব আদর্শবোধের কক্ষে বিধৃত, যেখানে রয়েছে চিরায়ত কিছু মূল্যবোধের স্নিগ্ধ দীপশিখা, যার সাথে হিংস্রতা, রক্তপাত ও জবরদস্তির মৌলিক বিরোধ। তাঁর আদর্শবোধ, বলা বাহুল্য, বিশ্বমানবিকতার, প্রেম ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি-চেতনার প্রতীক ; মানুষে মানুষে বিশ্বাস ও প্রেমনির্ভর সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে এক বিশ্বজাতীয়তা তথা বিশ্বনাগরিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি, যা এক বিশ্বধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। এ ধর্ম অবশ্য প্রচলিত বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। এই আদর্শ-সম্পৃক্ত বিষয়টির বিশদ আলোচনা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালিয়ানাকে কেন্দ্র করেও নাটক-উপন্যাস-গল্প-কবিতায় ফুটে উঠেছে তাঁর প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয়। কিন্তু কবিতা, গান, নাটক কিংবা প্রবন্ধাবলীর তুলনায় গল্পমালা তাঁর রাজনৈতিক চেতনার তীক্ষ্ণ প্রাখর্য নিয়ে ফুটে উঠেনি, এবং প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের রূপ তুলে ধরেই শেষ হয়ে গেছে। গ্রামীন জীবন বা ব্যক্তিক জীবন ও সামাজিক প্রেক্ষিতই সেখানে প্রধান উপজীব্য।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা প্রাথমিক পর্বে জাতীয়তাবাদী ধারায় আশ্রয় গ্রহণ করেও তাতে সর্বাংশে নিমজ্জিত হয়নি। বরং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরম-গরমে দ্বন্দ্ব, রক্ষণশীল অংশে জাতীয়তাবাদের আড়ালে হিন্দু—রিভাইভালিজমের আত্মপ্রকাশ, দেশের গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কিছুটা অনীহা ইত্যাদি অপূর্ণতা ও ভ্রান্তির সমালোচনা করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন তিনি। পল্লী-সমাজ ও কৃষক সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণাও সাদরে গৃহিত হয়নি, যেমন হয়নি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর আপন সমাজের রক্ষণশীলতা বিষয়ক সমালোচনা ও উপদেশাবলী। তদুপরি জাতীয়তাবাদের কোন কোন কর্মসূচী ও উগ্রতা যেমন তাঁর পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, তেমনি সমর্থন জানাতে পারেননি হিংস্রতাশ্রয়ী সন্ত্রাসবাদী ধারাকে। দেশে ইংরেজের

দমননীতি ও নির্যাতনের যেমন নিশ্চিত প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি দেশের নেতৃত্বকে আহ্বান করেছেন সামগ্রিকতার ভিত্তিতে দেশের সর্ব-অংশের মধ্যে আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটাতে, নিজেদের চিত্তশক্তিতে তাদের বলীয়ান করে তুলতে। মানবিকতার শান্তিবাদী আদর্শ যেমন প্রচার করেছেন 'মহামানবের' প্রতীকে, তেমনি দেশ বিদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তুলে ধরেছেন দীপ্ত প্রতিবাদ। তাঁর আন্তর্জাতিকতার আদর্শ সর্বমানব তথা সর্বজাতির কল্যাণে সমর্পিত। মানুষের চৈতন্যের উপর কোন প্রকার [illegible], তা ফ্যাসিবাদ থেকেই আসুক বা কম্যুনিজম থেকেই আসুক, সহ্য করতে রাজী ছিলেন না তিনি।

মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে অনুপ্রবেশ করলে তাতে নৈরাজ্য সৃষ্টির সম্ভাবনাই থাকে বেশী ; আর এ জিনিষটির প্রতিফলন রবীন্দ্রজীবনের রাজনৈতিক চেতনায় লক্ষ্য করা যায়, আর এই প্রেক্ষিতে দেখতে পাই যে প্রথম জীবনে সঞ্চিত শিল্প সাহিত্য রাজ্যের ইংরেজী মহত্ত্ব পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকালীন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলো, যদিও একই সময়ে ইংরেজের উপনিবেশী-নীতির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ নীরব ছিলোনা। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে, মানুষ ও মানবিকতার আদর্শ-মূলীয় চিন্তা তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাবৃত্তে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলো, যার ফলে জন্ম নিয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে কবির ধারণা-গত দুর্বলতা, স্ববিরোধিতা, কখনো আশ্চর্য বিচক্ষণতা বা দৃষ্টি-স্বচ্ছতা কখনো বা ভ্রান্ত মূল্যায়ন। এর কারণ, কবির চিন্তাধারায় দার্শনিকতার অভিক্ষেপ, আজন্ম-লালিত কিছু বিশ্বাসের প্রভাব ; সর্বোপরি রাজনীতি-অর্থনীতির তত্ত্বগত গভীরে প্রবেশের অনিচ্ছা এবং সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে পূর্বাপর সম্পৃক্ত না হওয়ার ইচ্ছা। তাই নিজে রাজনীতিতে জড়িত হয়েও শান্তিনিকেতনকে রাখতে চেয়েছেন সক্রিয় রাজনীতির স্পর্শ থেকে দূরে। একদিকে অন্যায় অত্যাচারকে ঠিকই বিদ্ধ করেছেন আক্রমণে, কিন্তু অন্যদিকে তার নিরসনে হিংসা বা রক্তাশ্রয়ী সংগ্রামের পথ বেছে নিতে রাজী ছিলেন না। তাই রাজনৈতিক ঘটনা বা সমস্যার বিশ্লেষণে সহজাত বিচক্ষণতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির সাহায্যে সঠিক বিন্দুতে পৌঁছে যেতেন ঠিকই, কিন্তু সমাধানের কর্মপন্থায় প্রভাব এসে যেতো শান্তিবাদী, মানবতাবাদী কবির সহিষ্ণু চৈতন্যের।

এই আত্মদ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধ রবীন্দ্রজীবনের রাজনৈতিক বৃত্তে পূর্বাপর উপস্থিত—এর ফল নিঃসন্দেহে শুভ হয়নি। কবিকে দীর্ণ, আহত, রক্তাক্ত

করেছে মাত্র। রবীন্দ্র-জীবনে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্টতার চরিত্র বিচার করে দেখলে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই কবি ও রাজনীতিকের এই দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। হয়তো সে সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা ছিলো বলেই কবি অনায়াসে একথা বলতে পেরেছেন ১৯২১ সালে সি, এফ, এন্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে: "আমার নিজের মধ্যে কবি ও প্রচারকের যে চিরকালের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই সূত্রেই বলছি; এদের মধ্যে একটির নির্ভর প্রেরণায়, অন্যটির সচেতন প্রয়াসে।" অর্থাৎ কবি সজ্ঞানেই রাজনীতির জটিল অঙ্গনে পা বাড়িয়েছিলেন, এবং এই সচেতন অভিলাষ হয়তো জড়িত ছিলো উদ্বেগ, শংকা ও ভবিষ্যত জুড়ে। আর তাই হিজলি-ক্যাম্পে গুলিচালনার প্রতিবাদ-সভায় এসে প্রথমেই বললেন যে এ সভায় আসার উদ্দেশ্য অবমানিত ও পীড়িতদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে সতর্ক করে দেওয়া। আবার, অনুরূপ মানসিকতা থেকেই জন্ম নিয়েছিলো জন-সংযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে কবির স্বীকৃতি, ১৯১৫ সালে এন্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে: "সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে জনকল্যাণের সহায়ক হতে হবে। দূর হতে শুধু ভাবের আদান প্রদান করলে চলবেনা, জনগণের সঙ্গে বাস করতে হবে।"

এমনি একটি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-মানসের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি কী দেশীয় বৃত্তে, কী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অধিকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নিজেকে প্রগতিশীলতার কক্ষে স্থাপন করেছে। শুধু কিছু দৃপ্ত, বলিষ্ঠ কবিতায় কিংবা তীব্র স্বাদেশিকতায় জারিত গানে অথবা সুতীক্ষ্ণ ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন অজস্র প্রবন্ধমালায় তাঁর রাজনৈতিক চেতনা সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং দেখা যায় রাজনৈতিক আবেগ-ধৃত মুহূর্তে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠিকই দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন—হিজলি-চট্টগ্রাম জালিনওয়ালাবাগ, দমননীতি আইন, অবাধ গ্রেপ্তার, মুদ্রাযন্ত্র আইন, বিনাবিচারে আটক ব্যবস্থা, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এর অজস্র প্রমাণ ছড়ানো। এমন কি শিল্পীর আত্মগরিমা নিয়ে এটুকুতেই তিনি তৃপ্ত থাকেননি, কিংবা ড্রয়িংরুম বাসী শিল্পীর মনস্বিতা নিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি চোখ বুজে থাকেননি। আর থাকেননি বলেই দেশের সত্যকার সমস্যা তাঁকে বারবার অস্থির ও উদ্বেল করে তুলেছে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগেও তাই সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসী-লাঞ্ছনায় যেমন ব্যথিত হাত প্রসারিত করেছেন, তেমনি কংগ্রেসের দক্ষিণী নেতৃত্বের সুভাষ-বিরোধিতার প্রেক্ষিতে গান্ধীজী-হিটলারের সমীকরণে কংগ্রেস-মঞ্চে জয়ধ্বনির ঘটনা তাঁর ব্যক্ত-

বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছে। সর্বোপরি, এদেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি মূল বিষয়ের শিকড় ধরে টান দিয়েছিলেন যাতে করে জাতীয়তাবাদী আদর্শ তার উদারনৈতিক কক্ষে একটি সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে আহ্বান করতে পারে এবং বাস্তব-ক্ষেত্রে একত্রিত করতে পারে। কিন্তু সামাজিক রক্ষণশীলতা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভ্রান্তি তথা খণ্ডিত জাতীয়তাবোধের প্রচ্ছন্ন চেতনা এবং বিদেশী-শাসনের বিভেদনীতির ফলে অই উদার গণতান্ত্রিকতাধৃত জাতীয়তাবাদের রাবীন্দ্রিক আদর্শ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্পষ্টই থেকে গেছে, বাস্তবে ধরা দেয়নি। তবু কবির অই দূরদর্শী প্রচেষ্টা বিস্ময়কর।

আমরা তাই সংশয়াতীত বিন্দুতে দাঁড়িয়েই দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় সমকালীন রাজনীতির কোণগুলো আপন-সংশ্লিষ্টতায় আলোকিত করে তুলেছেন, এবং তাঁর রাজনৈতিক চেতনা জনতা-নির্ভরতায়, আত্মশক্তির বিশ্বাসে এবং উপনিবেশিকতা-বিরোধিতায় এক সমৃদ্ধ আদর্শ সৃষ্টি করেছিলো। উপমহাদেশের জটিল রাজনীতির অঙ্গনে তার পদচারণা যে স্বচ্ছদৃষ্টি ও বিচক্ষণতায় চিহ্নিত, সে বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ বড় একটা নেই, এবং তা কবির রাজনৈতিক বিচক্ষণতার গভীরতাই দৃশ্যমান করে তুলেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, 'আনন্দমঠ'-এব প্রথম সংস্করণেব ভূমিকা
২. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রবচনাবলী—২য় (১৩৪৬) : পৃ. ৫৩৪
৩. ঐ 'সত্যেব আহবান', ববীন্দ্ররচনাবলী-২৪শ (বিশ্বভাবতী, ১৯৭০): ৩২২-৩২৩, ৩২২-৩৩৭
৪. ঐ 'নেশন কী', রবীন্দ্রবচনাবলী—৩য (কলিকাতা, ১৩৬৩) : ৫১৯, ৫১৭
৫. ঐ 'বারোয়ারি মঙ্গল', বচনাবলী—৪র্থ (কলিকাতা, ১৩৬৩) : ৪৪০
৬. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩১৪)
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অত্যুক্তি', রচনাবলী ৪র্থ (কলিকাতা, ১৩৬৩) : ৪৫৫

৮. ঐ 'ব্যাধি ও প্রতিকার' রচনাবলী—১০ম (কলিকাতা, ১৩৪৮) : ৬২৭

৯. ঐ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' রচনাবলী—৩য় (কলিকাতা, ১৩৬৩) : ৬১১, ৬১২, ৬১৩-৬১৪

১০. ঐ 'পথ ও পাথেয়', রচনাবলী—১০ম (কলিকাতা ১৩৪৮) : ৪৬৪-৪৬৬

১১. ঐ 'স্বদেশী সমাজ', রচনাবলী—৩য় (১৩৬৩) ; ৫৩২, ৫৩১

১২. ঐ 'সমাধান', রচনাবলী—২৪শ (১৩৭৭) : ৩৫৯

১৩. ঐ 'য়ুনিভার্সিটি বিল,' রচনাবলী—৩য় (১৩৬৩) : ৫৯৬, ৫৯৮

১৪ ঐ 'দেশনায়ক', রচনাবলী—১০ম (১৩৪৮) : ৪৯৪

১৫ ঐ 'স্বরাজ সাধন', রচনাবলী-২৪শ (১৩৭৭) : ৪১৯, ৪২১-৪২২, ৪১৮

১৬ ঐ 'ছোটো ও বড়ো', ঐ : ২৮৬, ২৮৭

১৭. ঐ 'স্বাধীকার প্রমত্তঃ', ঐ : ৩৯৫

১৮. 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবাব, প্রবাসী (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপমানের প্রতিকার', রচনাবলী-১০ম (১৩৪৮) : ৪১০-৪১৭

২০ ঐ 'কণ্ঠরোধ', ঐ : ৪২৪-৪৩১

২১ ঐ 'ইংরাজের আতঙ্ক', ঐ : ৫৩৭

২২ ঐ 'সফলতার সদুপায়', রচনাবলী-৩য় (১৩৬৩) : ৫৬৯

২৩ বিবিধ প্রসঙ্গ, 'রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব' প্রবাসী, (কার্তিক, ১৩২৪)

২৪ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'' প্রবন্ধ সম্পর্কে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, (ভাদ্র, ১৩২৪)

২৫ আজাদ, ৩রা আগষ্ট (১৯৩৭)

২৬. সম্পাদকীয় : আজাদ, ২০শে নভেম্বর (১৯

২৭ আজাদ, ১২ই অক্টোবর (১৯৩৭)

২৮ ঐ ৯ই নভেম্বর (১৯৩৭)

২৯. ঐ ২৮শে জুন (১৯৩৮)

৩০ ঐ ৯ই জুন (১৯৩৮)

৩১. ঐ ১২ই জুন (১৯৩৮)

৩২ ঐ ২৩শে নভেম্বর (১৯৩৭)

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রচলিত দণ্ডনীতি', রচনাবলী-২৪শ (১৩৭৭) : ৪৬৪

কবিস্বভাব ঃ শৈল্পিক সততায়

আমরা দেখেছি, দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এদেশে বিদেশী শাসনের অবসান-কল্পে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে প্রকাশ ঘটে তা অনাকাঙ্ক্ষিত কতক গুলো বিপরিত চরিত্রে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। একদিকে পরাধীনতার প্রতিবাদ এবং এর একাংশে সনাতন বিধি-ব্যবস্থার বিরোধিতা সত্ত্বেও আবেগ প্রধান ভক্তিবাদ ও সনাতন-অতীতের প্রতি প্রবল মোহ যেমন উপস্থিত ছিলো, তেমনি ছিলো এদেশের বিত্তহীন সমাজ ও মুসলমান সমাজের প্রতি অনীহা, যার ফলে জাতীয়তাবোধ খণ্ডিত-চেতনার প্রতীক হয়ে ওঠে। সাহিত্যেও এই আংশিকতার ও ভ্রান্তির প্রতিফলন ঘটেছে এবং টড প্রমুখদের প্রভাব এবং সেই সঙ্গে বংকিমচন্দ্র-বঙ্গদর্শন ও অনুরূপ প্রভাব স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে যে কার্যকরী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলমান-বিরোধী উপকরণ যুক্ত হয়ে 'হিন্দু রিভাইভাল-ইজমের' চরিত্র পরিস্ফুট করে তুলেছিলো। বিদেশী শাসন এ সুযোগ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলো এবং ভেদনীতির বীজ এমন ব্যাপকভাবে রোপণ করেছিলো, যার ফলে রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্যে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের স্রোতটি তার বিকল্প-স্রোতের চেয়ে প্রবলতর হয়ে ওঠেছিলো। জাতীয়তাবাদের এই ভ্রান্তির সাথে আরো সংযোজিত হয়েছিলো গান্ধীবাদী নীতির (চরকা-খদ্দর ইত্যাদির) অতীতমুখী ধ্যান ধারণা ও ক্রিয়াকর্ম। তাই, ইংরেজ-শাসনের প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষার সীমাবদ্ধ বিস্তার ও যন্ত্রশিল্পের অগ্রসরতায় দেশব্যাপী যে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের সম্ভাবনা নিহিত ছিলো, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে, সংকীর্ণতা ও ভ্রান্তির ফলে এবং সেই সঙ্গে শাসকের কূটনীতির ফলে বিভেদ ও অনৈক্যে তার সম্ভাব্য চূড়াগুলো ধ্বসে পড়তে থাকলো ; বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাধি রচিত হলো কূট কৌশলের অন্ধকার সুড়ঙ্গে।

আমরা এটাও দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে ইংরেজ-শাসনের বিরোধী ছিলেন। শুধু তাই নয় তাঁদের পারিবারিক আবহাওয়ায় রচিত হয়েছিলো বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় এই ধ্যান ধারণা, যদিও তার পিতামহ জীবনের অধিকাংশ সময় নব্য মুৎসুদ্দি-ধনতন্ত্রের বৃত্তে ব্যয় করেছেন। কিন্তু তারই নির্দেশে বিদেশী-বিরোধিতার প্রাথমিক সূচনা :

> “আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন, একথা সকলে জানেন। কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই, এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব-লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।”(১)

এ কি শেষবয়সে দ্বারকানাথের ভ্রান্তি-মোচনের চেষ্টা? যাই হোক, আধুনিক শিক্ষার ও যুক্তি-নির্ভর চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে দ্বারকানাথ এই পরিবারটিতে আধুনিকতার পত্তন করেছিলেন, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> “আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।...বড়দাদা বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষাকে জ্ঞান ও ভাব সম্পদে ঐশ্বর্যবান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মেজদা বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহার ভাব প্রকাশের ভাষা বাংলা। জ্যোতিদাদাও তরুণ বয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছেন। আমাদের পরিবারে পিতৃদেবকে ইংরাজি পত্র লেখা নিষিদ্ধ। আমরা আপনা আপনির মধ্যে এবং পারৎপক্ষে কোনো বাঙালিকে ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিনা।”(১)

এমনি একটি স্বদেশ-চেতনা-সমৃদ্ধ পারিবারিক আবহাওয়ায় অথচ আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতার দীপ্তিতে বড় হবার ফলে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের স্বাধীন-চেতনার সমর্থক হয়েও তার অন্তর্নিহিত ‘হিন্দু রিভাইভাল্-ইজমের’ বিরোধিতা করতে পেরেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে বর্জন করতে পেরেছিলেন বিদেশী-অনুকরণের অন্ধ ফ্যাসান :

> "বর্তমান কালে হিঁদুয়ানি পুনরুত্থানের যে-একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথম ওই অনৈক্যের ধূলা উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।...একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবী অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।"(২)

শুধু রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী বা চিঠিপত্রেই নয়, সাহিত্যেও এই বিশেষ মনোভঙ্গির সুপ্রকাশ পরিস্ফুট। 'বিসর্জন' কিংবা 'মালিনী' নাটকে ব্রাহ্মণ্যশক্তি শাসিত আচার-ধর্মের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি কবি, তন্ত্রমন্ত্র শাসিত সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার উৎসবে শক্তি প্রয়োগ করতে হোল তাকে। ধর্মাচার-ভিত্তিক জড়তা ও সংস্কার দূর করতে রক্তাক্ত যুদ্ধের প্রয়োজন হোল। বিষয়টি চমকপ্রদ আরো এই কারণে যে সেকালে তাই নিয়ে রক্ষণশীল সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক-জাত উত্তাপের মুখে রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে হয়েছিলো যে.ধর্মের উচ্ছেদ তাঁর লক্ষ্য নয়, বস্তুতঃ এ সব লেখারও নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সবল আবেগে কবি একথাও বলেছেন যে :

> "আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি ; সে শিকল আমার, সে শিকল সকলের। শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতেই হইবে। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিবনা।
>
> "অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবেনা, ইহাকেই বলে নিস্ফলতা।"(৩)

দেশব্যাপী অন্ধতা ও অচলায়তনিক সংস্কারের পাষাণ-প্রাচীর রবীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো বলাই বাহুল্য। 'মুক্তধারা'য় তাই দেখি উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সার বিরুদ্ধে শিবতরাইয়ের জনতার প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামে জনতার জয় সূচিত (১৯২৫)। রক্তকরবী নাটকেও (১৯২৬ খৃঃ) শ্রমজীবী জনমানসের বিচিত্র ও আপাত-বৈপরিত্যময় রূপচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কঠিন বেষ্টনীর দুর্গ থেকে উদার প্রান্তরের সমতল স্নিগ্ধতায় সমবেত মানুষের মধ্যে নায়কের নেমে আসা নিঃসন্দেহে প্রতীকি ব্যঞ্জনায় সুস্পষ্ট। এখানেও ধনিক সৈনিক-আমলাদের যথার্থ রঙে এঁকে,

তোলা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা শৈল্পিক সততায় ও নির্মোহ মানসিকতায় তুলে ধরা হয়েছে।

এমনি দৃঢ়তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ (তাঁর নাটকগুলোতে বিশেষ ভাবে) সামাজিক অনাচার, প্রথা ও জড়তার অন্ধ অচলায়তন ভেঙ্গে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো যাতে ভেঙ্গে পড়ে “অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর” এবং ভেঙ্গে যায় ‘জীর্ণ পুরাতন সব সামাজিক উপকরণ’। বলা বাহুল্য, এই সব উপকরণ রাজনীতির প্রগতি যাত্রায় বরাবরই প্রতিবন্ধকতায় কন্টকিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রাশিয়া-ভ্রমণের পর রচিত রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা’ নাটকটি অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনার বলিষ্ঠ প্রকাশে ও স্পষ্টভাষিতায় যেন এক সবিশেষ ব্যতিক্রম। সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে উচ্চকিত মনোভাবে জারিত এই নাটকটির প্রকাশকাল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। প্রসঙ্গটি এই নাটকে খুব জোরালো আবেগের সাথে এবং দৃষ্টিস্বচ্ছতায় তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের তাই বুঝতে কষ্ট হয় না, কেন রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পরিসরে ও চরিত্রে নিজেকে সমর্পণ করতে চাননি। তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী তিনি সাহিত্যের বাস্তবতা প্রসঙ্গে বিষয়টিকে তির্যক-বিশ্লেষণে উত্থাপন করেছেন ঃ

> “কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে ভালো বলি, কেননা স্বামীর প্রতি হিন্দু-রমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত তাহা তাহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়।
>
> “অন্যদেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজমের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।”(৪)

স্বদেশী জাতীয়তাবাদই নয়, বিদেশেও জাতীয়তাবাদ যে লোভের পাথরে ঘষে নিয়ে কেমন করে উগ্র-স্বজাতীয়তা তথা সাম্রাজ্যবাদের রূপ গ্রহণ করে সে সত্যও আর চাপা রইলো না। জাতীয়তাবাদের সংকট শিল্পীর মননে সংকটের সৃষ্টি না করে পারে না। জাতীয়তাবাদের চেহারায় পূর্ণতা আনয়ন, সংকট থেকে তার মুক্তি তখন পরম আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। মননশীল শিল্পীর সততায় কোন কোন পথের আভাস ছায়া ফেলে। রবীন্দ্র-মানসেও তাই পথের অন্বেষায় কিছু কার্য-কারণ ও সমাধানের রূপরেখা ধরা পড়েছিলো এবং তার মধ্যে অংশতঃ বাস্তবতার তথা সত্যের

প্রতিফলন ঘটেছিলো, যদিও তা শ্রেণী-তত্ত্বের স্বীকৃত অর্থনীতির সূত্রে প্রতিফলিত নয়।

প্রথমতঃ জাতীয়তাবাদকে তার পূর্ণাবয়ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একদিকে যেমন সামাজিক রক্ষণশীলতার দুর্গে আঘাত হানতে হবে (যা তিনি প্রবন্ধে, নাটকে, বক্তৃতায় বরাবর প্রকাশ করে এসেছেন) তেমনি দেশের অন্যতম প্রধান অংশ মুসলমান সমাজের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যাতে গরজের দায়ে নয়, সার্বিক ঐক্যবোধে উভয়ে যৌথ-ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে (বিষয়টি অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। এ বিষয়ে কবির বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের সভামঞ্চে দাঁড়িয়েও কবি বিষয়টির অপ্রিয়-সত্যের দিকে তর্জনি নির্দেশ করতে দ্বিধা করেননি। এ সম্পর্কেই সমাধানে উপনীত হবার এবং 'সামাজিক পাপগুলোকে' নিশ্চিহ্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে অন্যতম পন্থা হিসেবে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ব্যবহার তাঁর কাছে অত্যন্ত আশু ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিলো। কারণ, তাঁর মতে :

> "প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে, তখনই অন্যদেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।"(৫)

এখানে রবীন্দ্রনাথ দেশ ও ভাষা বলতে প্রদেশ ও তার ভাষা বোঝাতে চেয়েছেন। (এর অর্থ কি ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ?) এক ভাষার ঐক্যে গোটা উপমহাদেশ একাকার করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি, যা তার সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিচক্ষণতাই প্রমাণ করে :

> ভারতবর্ষে আজকাল ভাবের আদান প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারেনা ; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারেনা।"(৫)

সুসঙ্গত এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে (রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি) ঐক্য ও মুক্তির পথ হিসাবে বাংলা তথা বাংলা সাহিত্যের ব্যবহারিক সমৃদ্ধির প্রত্যাশা করেছেন, যার যথার্থ বিকাশ মুক্তবুদ্ধি ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতীয়তার উদ্ভব ঘটাতে পারে। কারণ, সাহিত্যের দায় জাতীয়তার বিকাশেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়, তার শৃঙ্খল মোচন, সুস্থ পরিবর্ধনেও সাহিত্যের মস্ত বড়ো ভূমিকা। যাকে আমরা সৌন্দর্যবাদী

বা তত্ত্ববাদী কবিরূপে জানি, তিনিই দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে সাহিত্যের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানো ও কল্যাণী ভূমিকার কথা অস্বীকার করা দূরে থাক, দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিপন্ন করছেন :

> “বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালী যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে; কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে। ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেকদিন হইতে অগ্নি সঞ্চয় করিতেছে। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে।”(৬)

সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধগুলোর আধুনিকায়ন এবং সেগুলোকে মুক্ত চেতনায় নিষিক্ত করে সার্বিক বোধের অনুকূলে সক্রিয় করে তোলা সাহিত্যের কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যও, রবীন্দ্রনাথের মতে এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। তার কারণ, কবির বিচারে

> “বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালী যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা সাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই।... এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য, এই সাহিত্যই বাংলার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাঁধিয়াছে।”(৭)

স্বভাবতঃই আমরা ধরে নিতে পারি যে এই গর্বিত বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যের সেই অংশের দিকেই তর্জনি নির্দেশ করেছে, যা বিদেশী শাসনের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙময়। আর সেই সূত্রে আমাদের মনে পড়ে যায় বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ, দৃপ্ত নামগুলো যাদের মধ্যে অন্যতম মাইকেল মধুসূদন, অক্ষয় সরকার, দীনবন্ধু মিত্র, কালিপ্রসন্ন সিংহ, মীর মশাররফ, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, হরিশ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের একটি মসৃণ ও প্রশস্ত পথও এই সাহিত্য, এবং রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

> "বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে-প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই।
>
> "সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন।"(৬)

পথ-অন্বেষার দ্বিতীয় উপায়টি হলো পল্লীগ্রামের বৃহত্তর জনমানসের সাথে ঐক্য স্থাপন, তাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো, এবং সর্বোপরি কবির পরিকল্পিত 'কর্তৃসভার' প্রস্তাব কার্যকরী করার মাধ্যমে দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীতে রক্তসঞ্চার করা। গ্রাম, কৃষক, জমি, জমিদার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে পরিস্ফুট হবে।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব ছিলোনা বলেই কবির বুঝতে কষ্ট হয়নি যে চরকা খদ্দর কিংবা সনাতন অতীতের জন্য হাহাকার প্রভৃতি পথে সত্যিকার স্বরাজ আসবে না। সামন্তবাদী অতীত ফিরে আসতে পারে না। বরং ইংরেজ যে যন্ত্রশক্তি তথা শিল্পবিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বুনিয়াদ গড়ে তুলেছে (প্রসঙ্গতঃ ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব স্মর্তব্য), তারই যথাযথ ব্যবহার, সীমিত অর্থে হলেও, এদেশের প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার একমাত্র উপায়,সেটা কৃষিক্ষেত্রেই হউক অথবা উভয় ক্ষেত্রেই হউক :

> "যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্ব-কর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে, তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে কি রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। আর দেখেছি রাশিয়ায়।"(৮)

রাশিয়ায় যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ও ব্যাপক শিল্পায়ন এবং সেই সঙ্গে সম্প্রদায়-ও ধর্মগত ভেদবুদ্ধির অবসান কবির অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এতে করে যেন এক কর্মপ্রেরণার গতিবেগ সঞ্চারিত হলো তাঁর মনে। স্বদেশে কৃষিক্ষেত্রে এবং অন্যত্র সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারে সম্পৃক্ত করে তুলতে চাইলেন জাতীয় চেতনাকে। সেই সঙ্গে সাহিত্যেও এর আভাস ফুটলো। ইতিপূর্বে বুর্জোয়া উদারচেতনার সামাজিক মূল্যবোধগুলো দেখা দিয়েছে তার সাহিত্যে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীর অধিকার প্রভৃতি উদার চৈতন্যে স্নাত সাহিত্য যেন নতুন পথের

সন্ধান দিয়ে চললো। যদিও এই সঙ্গে সৌন্দর্যতত্ত্ব, বিষণ্ণতা বা নৈঃসঙ্গ্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ও তার কাব্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে, তবু এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক সমস্যাবলীর তাৎক্ষণিকতা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ না করে পারেনি। পাশাপাশি দুই স্রোতে অবগাহনের মতো এই উভয়-চরিত্রেই সাড়া দিয়েছেন তিনি। তা না হলে সৌন্দর্যতত্ত্বে নিবিষ্ট কবির পক্ষে জাতীয়তাবাদের সভায়, সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে যাওয়া, সেখানে নিজস্ব কর্মসূচী তুলে ধরা, বাম-দক্ষিণের অন্তর্বিরোধে মধ্যস্থতা করা, বাম-বাংলার প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে গান্ধীজির সাথে মতবিরোধ, চরকা-খদ্দর-বয়কট প্রভৃতিতে সংশ্লিষ্ট হয়ে নিজস্ব স্বাধীন মতামত পেশ করা—প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে দীর্ঘকালীন সংশ্লিষ্টতার ব্যাখ্যা কোথায় ? নিভৃতে রস সৃষ্টির একনিষ্ঠতা নিয়ে নিরুদ্বিঘ্ন সময় কাটানোর সৌভাগ্য তো তার হয়নি ?

প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ তাৎক্ষণিকতার ডাক উপেক্ষা করতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই সৎ শিল্পীর সংকট, আত্মবিরোধ ও বৈপরিত্যের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন সমাপন করেছেন, বা বলা যায় করতে হয়েছে। জাতীয়তার বৃত্তে পূর্ণতা যখন সম্ভব হলো না, তখন নিজেই, সাহিত্যে ও কর্মক্ষেত্রে, তাঁর সীমাবদ্ধ বৃত্তে চেষ্টা করেছেন অভিষ্টকে খুঁজে পেতে, তার পূর্ণাবয়ব রূপের নির্মাণে কবির আন্তরিকতার অভাব ছিলোনা। সমাজের স্থবির পাষাণে যেমন আঘাত করেছেন, করেছেন সাম্প্রদায়িক অমানবিকতার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তেমনি ছুটে গেছেন অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। আবার অন্যদিকে পল্লী-উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারে যেমন একাগ্র হয়েছেন, তেমনি চেষ্টা করেছেন সার্বিক কাঠামোয় শান্তিনিকেতনে একাধারে 'মহামানবের' ও কর্মিকের পীঠস্থান তৈরি করতে। স্বদেশের আধুনিক-মুখী উন্নতি যেমন ছিলো তার কাম্য, তেমনি জাতীয়তাবাদের অবাধ ধন-সঞ্চয়ের মাধ্যমে উপনিবেশী লিপ্সার প্রতি ছিলো তার বিতৃষ্ণা ও বিমুখতা! সর্বতোভাবে মানবিক ধর্ম ও শান্তির উদবোধনে তার চেতনা ছিলো একাগ্র। তাই পরাধীন ভূখণ্ডের বৈপরিত্যময় জটিল উপকরণের উপস্থিতিতে যে পূর্ণাবয়ব গণতান্ত্রিকতার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলোনা রবীন্দ্রনাথ এক অর্থে তারই মহতী অংশের প্রতিনিধি।

অবশ্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার বৃত্তে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অধিষ্ঠিত করে দিতে পারলে আমাদের সমস্যা ও সংকটের অবসান ঘটতো,

কিন্তু জাতীয়তার পরিবেশ যেমন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখতে বা ঠাঁই দিতে পারেনি, তেমনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদার কাঠামোয় তাঁর বিচিত্রগামী চরিত্রের স্থান সঙ্কুলান হয়নি। তাঁর বিচক্ষণতা, অতি সংবেদনশীল মনন এবং সর্বোপরি উত্তম অভিনবকে আত্তীকরণের ক্ষমতা ও ইচ্ছা তাঁকে বরাবর এবং বারবার পথের অন্বেষায় উন্মনা ও ব্যাকুল করে তুলেছে। তাই অভিনবত্বে ও বৈচিত্র্যে, সৃষ্টির ব্যাপকতায় ও গভীরতায় বাংলাসাহিত্যে তাঁর তুলনা নেই। সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, এইসব বিভিন্ন স্তর উত্তরণে দ্বিধা, সংশয় কিংবা সংকট তাঁর কম ছিলো না ; যতটুকু সমাপন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো, কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু দ্বিধা তাঁকে সেইসব দুর্গম-ভূমি বিজয়ের সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রকৃতিগত এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেখা যায় রাশিয়া-ভ্রমণের পর লেখা নাটকের (কালের যাত্রা) সাথে পূর্ববর্তী নাটকগুলোর বিষয়গত গুণগরিমায় পার্থক্য। এখানে সংঘবদ্ধ বিত্তহীন মানুষের জয়যাত্রা ও সাফল্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে উঁচু-নিচুর প্রভেদ নিশ্চিহ্ন করে দেবার আকাঙ্ক্ষায়। 'প্রলয়' এই নাটকে যেন গুণগত পরিবর্তন তথা বিপ্লবের প্রতীক, যা 'যুগান্তরের' সৃষ্টি করে থাকে। বাধা পেলে উদ্বুদ্ধ সংঘশক্তি যে আপন শক্তির সচেতনতায় পৌঁছায়, এ বোধও সুস্পষ্ট মহিমায় চিত্রিত। শাসনদণ্ডের ভয় এই শক্তিকেই :

> "বাধা দিয়োনা ওদের।
> বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
> চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।" (কালের যাত্রা)

তবু শেষ রক্ষা হয়না শাসনচক্রের কূটবুদ্ধিতেও। জয় হয় অবমানিতের ; নির্যাতীত বিত্তহীন মানুষের। নাটকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটু তাই সন্ধান নিতে হয়।

অগ্রগতির প্রতীক মহাকালের রথের চাকা থেমে গেছে অনড় হয়ে। এর ফলে দেশশুদ্ধ লোক উপোষে মরার উপক্রম। রথের চাকায় গতিবেগ সঞ্চারে এগিয়ে এলো ধর্ম তথা পুরোহিত, এলো সৈনিক, তবু চাকা স্তব্ধ। ত্রস্ত হয়ে এলো রাজা তথা শাসনদণ্ড, সঙ্গে তার সমর্থক ধনিকের দল, কিন্তু রথ অনড়। ইতিমধ্যে দেশজোড়া ধর্মান্ধ নরনারী রথের রশি বা দড়িটাকেই "দড়ি ভগবান" রূপে পূজা দিতে শুরু করেছে। প্রতীকধর্মী এই নাটকে কবি কয়েকটি ছত্রে আধুনিক ধনতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন

করেছেন : "একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পেছনে থাকে বেনে। যাকে বলে 'অর্ধ-বেনে রাজেশ্বর' মূর্তি।" রাজা এক্ষেত্রে শাসনযন্ত্রের প্রতীক, সেকথা বলাই বাহুল্য। আর সাধারণ মানুষও জানে : "কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র, চলে কেবল স্বর্ণচক্র।" এদিকে রাজার হাত লেগেও যখন রথের চাকা ঘুরলো না, তখন দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে ছুটে এলো নিপীড়িত, বিত্তহীন, নিচুতলার বলিষ্ঠ মানুষ যাদের দলপতি স্পর্ধিত আত্মবিশ্বাসে পুরোহিত সৈনিক ও অন্যান্যদের ঘৃণার জবাবে অনায়াসে বলতে পারে :

> "আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—
> আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।" (কালের যাত্রা)

তারা জানে, সংসার চালায় তারাই। কিন্তু এদিকে অনর্থ বাধাতে চায় পুরোহিত, ধর্মান্ধ ভক্তের দল, সৈনিক ও ধনিকের দল, রক্তপাত ঘটাতে চায় শুচি-অশুচির প্রশ্ন তুলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিত্তহীন, সর্বহারাদের পেশী-সচ্ছলতার টানে গতিবেগ সঞ্চারিত হয় রথের চাকায় ; রথ কিন্তু এগিয়ে চলে শেঠজী (ধনিক)দের ধনভাণ্ডার লক্ষ্য করে। আর তখনি সৈনিকদল (শাসনযন্ত্র রক্ষার প্রতীক) ছুটে যেতে চায় ধনিক কুলের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। ওরা শুনতে পায় ধনপতিদের ডাক : "ওই দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের। রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ধনভাণ্ডারের মুখে, যাই ওদের রক্ষা করতে।" কিন্তু তাদের সাধ্য কি রথের নাগাল পায়! পেছনে পড়ে রইলো পুরোহিত, রাজশক্তি ও ধনপতির দল। আর তখন অই পরিবেশে ডাক পড়লো মানুষের কবির (এ কি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ?), যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে নবযুগের গান (না কি নজরুল ?)। সেই কবির দৃপ্ত ঘোষণায় ঝলসে উঠে রাজনীতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীর যুগচেতনা, যার উপর ভিত্তি করে নবসৃষ্টির সূচনা (নিশ্চিতই সুকান্ত) :

> "যুগাবসানে লাগেই তো আগুন ;
> যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
> যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।"

নবসৃষ্টির প্রেরণায় কবির প্রাণে দোলা লাগে, তার দৃষ্টি দিগন্ত-প্রসারিত। কারণ, সামনে রয়েছে সেইদিন যখন "আবার নতুন যুগের উঁচুতে-নিচুতে

হবে বোঝাপড়া।" তাই নাটকে সমাজ-সচেতন কবি ভক্তিবাদের চোরাবালিতে আবদ্ধ, ভ্রান্তপথ-গামী জনতার উদ্দেশ্যে আকুল আবেদন জানায় আপন-বিশ্বাসের দৃপ্ত পটভূমিতে ঃ

> "রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়োনা কাদা করে।
> আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
> যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে ;
> যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

স্বশ্রেণী-চ্যুত মানুষের কবির এই ভূমিকায় রৈবিক-মানসের সামান্যতম প্রতিফলন কি ঝলসে ওঠেনা ? আমাদের কি মনে পড়বে না চার বছর পরে (১৯৩৬) 'পত্রপুটের' কবিতায় কবির সেই দৃপ্ত উক্তি ঃ "আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা, আমি জাতিহারা।" আজো কি এই উপমহাদেশের অংশগুলোতে উল্লিখিত বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা ফুরিয়ে গেছে ? অবশ্যই নয়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে অর্থনৈতিক অসাম্য সম্পর্কে কবির ভাবনা ও বিতৃষ্ণা লক্ষণীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

> "মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"(৯)

স্বভাবতঃই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 'কালের যাত্রা' অবমানিত, বিত্তহীন মানুষের দুঃখ অবসানের জয় ঘোষণায় উচ্চকিত এবং অনাগতের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত ; এর যাত্রা কালান্তরে। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র—কোনো ব্যবস্থায়ই সমাধান পাওয়া গেলোনা। অর্থাৎ মহান শৈল্পিক চৈতন্যের প্রমাণ দিয়ে সেই সৃষ্টিশীলতায় প্রতিফলিত হয়ে উঠলো সমাজ-বাস্তবতার কিছু সচেতন ছবি, পরিবর্তন ও ভাঙ্গনের রূপ রেখা। তিরিশের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তাল আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রূপক নাটক 'তাসের দেশ' সম্ভবত কবির চিত্ত-বিক্ষোভ নিরসনের একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়া।

তাসের দেশ তাই শুচি-অশুচির বেড়াজালে ও অন্ধতার খোপে আবদ্ধ, যেখানে জীবন শিকলের বন্ধনে (বিদেশী শাসনের প্রতীক ?) বাধা।

মশালের আলোয় জয়ধ্বজা উড়িয়ে ভাঙ্গনের অভিসারে যাত্রার আবহ নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। কারণ, ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তা সৃষ্টিশীলতার বাঁকে না পৌঁছে থামতে জানে না। নাটিকাটির বিশেষত্ব যে এতে উত্তরণের এবং পরিণতির পর্যায় লক্ষ্যণীয়। বিবর্তন বা সংস্কারবাদিতার পথে নয়, ভাঙ্গনের সুস্পষ্ট পথ ধরে তাসের দেশ-এর মানুষের দেশে উত্তরণে এবং মুক্ত ও পূর্ণ মানুষ হবার সাধনার মধ্যে নাটিকাটির সার্থকতা। এখানে বাঁধভাঙ্গার উদ্দাম কলরব আমাদের কানে আসে, আসে মুক্তির ডাক :

> "মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে,
> ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
> রুদ্র রথের চাকাতে।"

বাধ্যতামূলক আইন তখন আর বিদ্রোহী মানুষগুলোকে ধরে রাখতে পারে না :

> "বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মূঢ়তার অপমানে। চলো বেরিয়ে পড়ি।...
>
> "আজ একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙ্গতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে নিরর্থকের আবর্জনা।"

'তাসের দেশ'-এ কয়েকটি অভিনব বিষয়ের পারম্পর্য, আমাদের মনে হয়, কৌতূহলী পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে। এক, নাটকটি ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হলেও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, যা প্রচলিত পাঠরূপে স্বীকৃত, প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৩৯ সালে, যখন কংগ্রেসে দক্ষিণ-বামের প্রবল সংঘাতে গোটা দেশ আন্দোলিত। দুই, এর প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ তৎকালিন বাম-বাংলার শক্তি ও যৌবনের প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়। এবং উৎসর্গ-পত্রে বলা হয় : "স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ"...ইত্যাদি। তিন, সম্ভবতঃ এই 'নতুন প্রাণ সঞ্চারের' যথার্থ আবহ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে নাটিকার শুরুতেই "খর বায়ু বয় বেগে" গানটির সংযোজনা, যার অন্তরে ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম গতিবেগ, এবং শক্ত হাতে হাল ধরে তরঙ্গিত জলরাশি পার হবার ব্যঞ্জনা। চার, অনুরূপভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে শুধু পুঁথি আর বাধ্যতামূলক আইন (সম্ভবতঃ অন্ধ আচার ও বিদেশী শাসনের প্রতীক)

ভাসিয়ে দিয়েই নয়, বন্ধন মোচনের প্রচণ্ড শক্তিমত্তার জয়গানে ("বাঁধ ভেঙ্গে দাও, বাঁধ ভেঙ্গে দাও") প্রদীপ্ত হয়ে।

আমাদের বিশ্বাস, এই পারম্পর্য আকস্মিক নয় মোটেই। যে আবেগ ও ধ্যান-ধারণার গুণগত রূপ কবি সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ হলেন, সম্ভবত 'তাসের দেশ' লিখে সেই আবেগের নির্মোচন সম্ভব হলো (দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'মেটাফিজিক্যাল ক্যাথারসিস')।[৭] এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। 'তাসের দেশ'-এ "অভাবের অভাব" বাক্যটি হয়তো বহুখ্যাত Negation of Negation-এর তাৎপর্যে চিহ্নিত নয়, তবু বাক্যটির ব্যবহার, বিশেষতঃ 'তাসের দেশ'-এ, আমাদের চকিত বিস্ময়ের কারণ।

সেই সঙ্গে আমরা এও লক্ষ্য করি, কেমন করে কবি বার বার যৌবনের দৃপ্ত শক্তি সম্বল করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তারুণ্যের সংগ্রামে (প্রসঙ্গতঃ সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠি স্মর্তব্য, যেখানে বাঙলা এবং বিপ্লবী বাঙলা কবির অভিনন্দন কুড়িয়েছে) প্রদীপ্ত হয়ে উঠেন, আবার আন্দোলনের ব্যর্থতায় আপন বৃত্তের কাব্যিক উদ্যানে ফিরে আসেন (প্রসঙ্গতঃ আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রেক্ষিতে নজরুলের অনুরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া স্মর্তব্য)। শুধু অসাফল্যই নয়, মতভেদ এবং অস্বিষ্টকে আন্দোলনের রূপচরিত্রে দেখতে না-পারার ক্ষোভ প্রভৃতি বিচিত্র কারণ বারবার কবিকে সংগ্রামের পথ থেকে ঠেলে দিয়েছে 'দূরে, বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে'। কিন্তু সাহিত্যের সেই স্বপ্নলোকে স্থায়ী অধিবাস সম্ভব হয়নি এই সংবেদনশীল কবিসত্তার। অত্যাচারিতের ডাক, রক্তঝরা কান্না তাঁকে বার বার ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবের কঠিন মাটিতে, আর সৃষ্টিতেও এঁকে দিয়েছে বাস্তবের মাটি-মাখা বৈচিত্র্যের ছাপ :

> "নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক।...যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি।"(৮)

এতবড়ো ভয়াবহ স্বীকৃতি ও আত্মসমালোচনা একজন যথার্থ সৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু নিশ্চেষ্ট বা অনড় আত্মধিক্কারই নয় শুধু। এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ সত্যদর্শন সম্ভব হলো সমাজের গভীরে নিরীক্ষামূলক

দৃষ্টি নিক্ষেপের ফলে। তাঁর চোখে ধরা পড়লো যে বৈষম্য সমাজকে গতির কেন্দ্রবিন্দুতে আকৃষ্ট করে ; দ্বান্দ্বিক গতিবেগে সমাজ এগিয়ে চলে পরিবর্তনের পথ ধরে। এই অনুভবের কাল ১৯১১ সাল :

> "জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য, যতক্ষণ তাহা চলে। যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর-এক শ্রেণীকে পায়ের তলায় ফেলিব এই বাধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দেই, তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি।"(১০)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলোতে বিশেষভাবে এই সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি খুব তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত করেছেন। অবশ্য তাঁর নাটক প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ কেউ কেউ তুলে থাকেন যে সেখানে ক্ষেত্রবিশেষে যন্ত্রের বিরোধিতা করা হয়েছে (যেমন 'মুক্তধারা'), কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যে এর বিপরিত সত্যই উদ্ভাসিত হতে দেখেছি। বিষয়টি তিনি অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন :

> "আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে এক লোক ধনী আর হাজার হাজার লোক তার ভৃত্য। এস্থলে আমাদের এই কথাই বলতে হবে—যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে—শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে।"(১১)

এতো কোন ধনতান্ত্রিক চেতনার বা বুর্জোয়া-বোধের কবির আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না যে ধন ও তার শক্তি সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্ত হবে ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণার ক্যানভাসে ধনবৈষম্য দূর করার কথা বারবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করেছেন, এবং রাশিয়া-ভ্রমণের পর বিষয়টি আরো জোরে উত্থাপিত হয়েছে। এবং সামাজিক বৈযম্য সৃষ্টিতে ধনের প্রবল ভূমিকা তাঁর রচনায় একাধিক স্তরে স্বীকৃত :

> "ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম সৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমেনা, কিন্তু ধন জিনিষটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকেনা। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

> **"তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করেনা, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখা হয়।"(১২)**

ধনবৈষম্যের প্রভাব যে সমাজের বিত্তহীন স্তরে (এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-চেতনার বৈশিষ্ট্যের নিরিখে 'শ্রেণী' শব্দটির সমান্তরাল অর্থজ্ঞাপক শব্দ 'স্তর' ব্যবহার করা হয়েছে) বিপদজনক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, অন্ততঃ সেটুকু সচেতনতা রবীন্দ্রমানসে উপস্থিত ছিলো বলে মনে হয়। কারণ, অর্থনীতি-সমাজনীতির সূত্রে শ্রেণী-বৈষম্যের বিশ্লেষণে যে রূপ ধরা পড়ে ধনবিন্যাসের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী-রাজনীতিতে প্রাজ্ঞ না হয়েও তেমনি একটা বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারপ্রান্তে এসে পেঁাছেছিলেন, এবং কতকগুলো বিষয়ে আশ্চর্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নজির রেখেছেন। শ্রেণী-রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিজ্ঞানে সমৃদ্ধ না হয়ে একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিলো ধন-বৈষম্য জাত বিত্তহীন অবস্থার উপলব্ধিতে পেঁাছানো ; এমন কি এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং পরিণাম সম্পর্কে বাস্তব ধারণায় উপস্থিত হওয়া। বাস্তবিক, আমাদের এ অভিজ্ঞতা বিস্ময়ে নিটোল ঃ

> "শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয়না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিস্কৃতি নেই।...
>
> "সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম।"(১৩)

বিশ্বব্যাপী ধনের এই প্রবল সামাজিক ভূমিকা এবং তার দুই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া—রবীন্দ্রচেতনায় বাস্তব চিত্র নিয়েই ধরা দিয়েছিলো। এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই তাঁকে বোঝবার অবকাশ দিয়েছিলো যে গোটা পৃথিবীতেই এখন ধনের তথা ধনিকের রাজত্ব ; সেই সঙ্গে শক্তির রাজত্ব (ধন=শক্তি, এই সমীকরণের তাৎপর্য এর বিভিন্নমুখী পরিণতির সম্ভাবনা নিয়েই রবীন্দ্র-মানসে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিলো)। স্বভাবতঃই ধনের লড়াই শক্তির লড়াইয়ে পরিণত হতে বাধ্য, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ফুটে উঠে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ-ফ্যাসিবাদের চেহারায় ঃ

> **"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তাহার গান্ধর্ব্য বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।**

> "এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিলোনা।
> "য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।"(১৪)

ধনশক্তি ও উপনিবেশবাদ সম্পর্কে কী সুস্পষ্ট চিত্র-চরিত্র। বণিকের মানদণ্ড শুধু এই উপমহাদেশেই নয়, এশিয়া-আফ্রিকার সর্বত্র রাজদণ্ডরূপে যে ভয়াল হয়ে উঠেছে, সে উপলব্ধিতেও কবি সজাগ। এর পরিণামগত শোষণের রূপটিও তখন আর অনাবিষ্কৃত নেই :

> "শক্তির ধারাটা এখন বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক-সাধারণের কাঁধের উপর তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপন ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলে স্টীম উৎপন্ন করে। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।"(১২)

যন্ত্র ও ধনের কব্জায় বৈশ্য অর্থাৎ শিল্পপতিদের হাতে সম্বলহীন মানুষ কেমন করে বিত্তহীন যন্ত্র তথা শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে, সে ভয়াবহ প্রক্রিয়াও বুঝি কবির নজর এড়ায়নি। এদের জীবন যাত্রা যে সাধারণ মানবিক মানদণ্ডের অনেক নিচে, বড় ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং অনুভব করতে পেরেছিলেন বিত্তহীন ও বিত্তবানের মধ্যে আসন্ন সংঘাত :

> "ইহার পর আরেকটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে।"(১৪)

রবীন্দ্রনাথ ধনশক্তি, শ্রমিক, শ্রমিক-শোষণ সম্বন্ধে কখনো ভাবেননি, এ ধারণা যে ভুল তা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। দয়ায় বা দানে যে এ সমস্যার সমাধান নিহিত নয়, প্রয়োজনের তাগিদেই এ বৈষম্য দূর হওয়া উচিত, মানবিকবোধ-সম্পন্ন কবি-মানসে তা প্রতিফলিত হয়েছিলো। শ্রমিক জনতা যে নিজেদের অবস্থা ও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নয়, এবং সংস্কারের ঠেকা দেওয়া ব্যবস্থায় যে কোনো স্থায়ী সমাধান আসবেনা, তাও সুস্পষ্ট :

> "আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, আর তাহারা কেবল

> সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে। আমরা জমিদারকে বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া বলি, তোমার কর্তব্য করো ; মহাজনকে বলি, তোমার সুদ কমাও। তাহাতে এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে, কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশী।"(১২)

কিন্তু আসন্ন উপপ্লব ঠেকানোর চেষ্টায় ধনিকতন্ত্রও কম সুকৌশলী এবং কম তৎপর নয় :

> "তাই ওদেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে। তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনো মতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা।"(১২)

শ্রমজীবীর বিত্তহীনতার পরিপূর্ণ প্রতিকার না হলে তার পরিণাম যে ভয়ংকর সে সত্য শুধু প্রবন্ধে বা নাটকেই নয়, বিভিন্ন কবিতায়ও মূর্ত হয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও এই ক্ষোভ শৈল্পিক সততার স্পর্শে ধনতন্ত্রের প্রতি অভিশাপের মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে :

> "মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
> অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
> দেহে নাই শীতের সম্বল,
> অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,...
> অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
> দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।"১৫

ঐশ্বর্যের পাশাপাশি অনশনের বিপুল ক্ষতমুখ সামাজিক অন্যায়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সামাজিক বৈষম্যজাত দারিদ্র্য রাষ্ট্রের মহা দায়, তেমন রাষ্ট্রের পরিণতি এক ডানাকাটা পাখীর মত, আর শ্রেণীবিভেদ জনিত "ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতন" সম্পর্কেও কবিমানস স্থির-নিশ্চয়। একজন মানবিক-চেতনা সম্পন্ন কবির দূরদৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও গভীর না হলে শ্রেণী-বৈষম্যের বাস্তব চেহারা ও তার পরিণতি অনুধাবন সম্ভব নয়। এমন কি ধনতান্ত্রিক সভ্যতা শ্রমজীবী জনতার শোষণে পুষ্ট এবং শোষণ-সঞ্চিত ধনের অর্জনে পরজীবী চরিত্রে চিহ্নিত, এ বোধ কবি বারবার ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্যা সমাধানে কবির বক্তব্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। আমরা

দেখেছি, সন্ত্রাসবাদ বা অনুরূপ বিষয়ে কবির প্রত্যক্ষ শক্তিপ্রয়োগ বা জবরদস্তির প্রতি বিমুখতা। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য অবসান কল্পে কবি, একটি নয়, একাধিক প্রবন্ধে, ‘শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়ার’ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন নির্দ্বিধায় ঃ

> “পূর্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষের মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকেরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। **“আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে।”**(১২)

তাই প্রতিকারের যথার্থ উপায় “নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা।” ধনতন্ত্রের কক্ষ থেকে সমস্যার সমাধান নেমে আসবেনা ঃ

> “তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। অর্থোপার্জনের কঠিন বেড়া দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশ-পথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বললাভ ক’রে তার প্রতিকার করতে হবে।”(১৬)

স্বভাবতঃই পাঠকের মনে হবে একজন সৌন্দর্যবাদী কবির কী ভয়ানক বৈপ্লবিক, শ্রেণী-সচেতন বিবর্তন! কিন্তু শোষিতের প্রতি শুভ কামনা সম্পন্ন কবি এর বেশী এগুতে পারেননি, যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয়তাবাদ এসব সমস্যার সমাধান আনতে পারবেনা। এতদসত্ত্বেও কবি ‘রাজপথের’ সন্ধান দিতে পারেননি, অর্থাৎ সংগ্রামের পথে সমাধান খুঁজতে যাননি। তাঁর ভাষায় ‘রাজপথ না হয়তো অন্ততঃ গলি রাস্তা হওয়া চাই’ আপাততঃ। আর সে গলি রাস্তার সমাধানটা তাঁর মতে ‘জনশিক্ষা’ যার মাধ্যমে “নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করে” তুলে ধনশক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব। অর্থাৎ পথটা হল শান্তিবাদের পথ, এখানেই মানবতাবাদী, শান্তিবাদী কবির সংকট ; তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সীমাবদ্ধতা। শ্রেণী-শোষণের মূল তত্ত্বটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না হবার ফলেই সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান তাঁর কাছে অধরা রয়ে গেল। আপন ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে বিত্তহীন মানুষের প্রতি মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে শিক্ষাকে শেষ গন্তব্যস্থল রূপে চিহ্নিত করেননি। বলতে

চেয়েছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ বিবেচনায় এদেরকে শিক্ষিত করে তোলার অর্থ তাদের স্বীয় শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, যাতে অন্ততঃপক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছবার 'মেটে রাস্তাটি' তৈরি হয়। কিন্তু বিবর্তনের এই পথ যে শেষ পর্যন্ত সামাজিক পরিবর্তনের গুণগত স্তরে পৌঁছাতে পারবেনা, সে দিকটা কবিচৈতন্যে ধরা পড়েনি।

প্রসঙ্গতঃ অনুধাবন করা চলে যে আপন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কবির সচেতনতা, সমাজের উচ্চমঞ্চেবাস জনিত স্বীকৃতি, আক্ষেপ, দুঃখবোধ তাঁর শৈল্পিক সততা থেকে উৎসারিত। 'আমি জানি আমি সব পারিনা, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করি'—বুদ্ধিজীবীর এই মানস-সংকট শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, সব যুগের বুদ্ধিজীবীর মানস-সংকট। আর এই সংকটের ও সংশয়ের উৎসমুখে তৎকালীন রাজনীতির দুর্বলতা, অসাফল্য ও স্ববিরোধ যে কম বেশী প্রতিফলিত, সে তথ্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিধা সংশয়ের মুখে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে না পারবার বেদনা বিভিন্ন রচনায় স্থান পেয়েছে ঃ

> "মানুষের অসম্মান দুর্বিসহ দুখে
> উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
> ছুটিনি করিতে প্রতিকার—
> চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।"(১৭)

রবীন্দ্রনাথের এই শৈল্পিক সততা যেমন অনন্য, তেমনি 'ভঙ্গি দিয়ে ভোলানোর' বিরোধী। উপর্যুক্ত স্বীকৃতি, আমাদের ধারণায়, কবির কিছুটা বিনয়, কিছুটা আক্ষেপ। কারণ, হিজলি, চট্টগ্রাম, জালিনওয়ালাবাগ, অ্যানি বেসান্ট ও দমননীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে এবং পরবর্তী আলোচনায় সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের উচ্চকণ্ঠে যে পরিচয় বিধৃত, তাতে এই আত্মধিক্কারে আংশিক বিনয়ের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

দ্বিধাহত শিল্পী তাই বারবার পথের সন্ধান করেছেন, যা তাঁকে অভিষ্টের কক্ষে পৌঁছে দেবে। যে গণতন্ত্রের উপর ছিলো এতো আস্থা ও বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও গর্ব, সেখানেও স্থায়িত্বের ঠাঁই মেলেনা, পাওয়া গেলোনা তাকে, যাকে চাই। এ যেন রাবীন্দ্রিক চেতনার সোনার হরিণের

পেছনে ছুটে চলা। একনায়কত্ব সহ্য হলো না সত্য, কিন্তু বহুনন্দিত যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রেও প্রত্যাশা পূরণ হয় না :

> “যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকল-রকম প্রতাপের বাহক হচ্ছে অর্থ। তাই য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌-এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলেনা।”(১৮)

মার্কিন গণতন্ত্রের মুখোশ তিনি খুলে ধরেছিলেন রাশিয়া ভ্রমণের আট-বছর আগেই। আমাদের বিশ্বাস পথ-সন্ধানী এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনেকেরই অচেনা। তাই গণতন্ত্রে বিশ্বাস হারালেও সমাজ-প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁর বিশ্বাস ছিলো শেষ অবধি, যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রাধান্য সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং সমাজ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বলা বাহুল্য, এ সমাজতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে অঙ্কিত, এখানে বহুচেনা সমাজতন্ত্রের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবেনা। এখানে কবি তাঁর বহুসমস্যাসঙ্কুল ব্যষ্টি ও সমষ্টির একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। বিষয়টি তিনি খুব সুস্পষ্ট রূপ রেখায় তুলে ধরতে পারেননি (পথ নির্দেশ সম্পর্কে তাঁর মানসদ্বন্দ্ব ও দ্বিধাই সম্ভবতঃ এর কারণ)। রবীন্দ্ররচনার সতর্ক পাঠে উল্লিখিত সূত্রটিকে উঁকি ঝুঁকি দিতে প্রায়শঃই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাস্রোত যথেষ্ট সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও উৎসুক পাঠক দেখতে পাবেন যে তাঁর মধ্যে কবি ও রাজনীতিকের এক প্রবল দ্বন্দ্ব প্রবহমান। আর রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নোত্তর রবীন্দ্র-রচনায় সঠিক তাৎপর্যে সর্বক্ষণ পাওয়া যাবে, এ জাতীয় ধারণাও নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জন। তবে একথাও ঠিক সমস্যার নির্ভুল সমাধান পেতে রবীন্দ্রমানসের প্রচেষ্টা ছিলো আন্তরিক। তার আজন্ম লালিত পরিবেশ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা (ক্ষেত্রবিশেষে অভিজ্ঞতার অভাব) এবং কিছু কিছু প্রাচীন বিশ্বাসধৃত মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রান্তি-আচ্ছন্নতার কারণে রাবীন্দ্রিক দ্বিধা-সংশয়-আত্মবিরোধের অবসান ঘটলোনা শেষ অবধি।

বহু-উল্লিখিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নিরসন না হওয়াতে তাঁর আত্যন্তিক শৈল্পিক সততা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে তিনি জীবনের পরিপূর্ণতায় গ্রহণ করতে পারেননি এবং সেই বিশেষ বৃত্তে তাঁর জীবনদর্শনও পূর্ণাবয়ব সত্যের সন্ধান পেলোনা, খণ্ডিত-আংশিক সত্যদর্শন ও সত্যগ্রহণের মধ্যেই তাঁকে তৃপ্ত থাকতে হোল। অথচ রাজনীতিকের জীবন একটানে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। বারবার ঘুরে ফিরে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে "মানুষের দুর্বিসহ যন্ত্রণার" মূলে সাম্রাজ্যলিপ্সার তথা উপনিবেশিকতার নিষ্ঠুর বহিঃপ্রকাশ, মানুষকে দাসত্বে নিক্ষেপ করার প্রবল দম্ভ। তাই বার্ক, ব্রাইট, মেকলে, কিংবা শেকসপীয়ার-বায়রণ-শেলী-কীটস প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিত্বের আলোয় ধৃত ইংরেজী-সভ্যতার সদ্-পরিচয় মিথ্যা হয়ে যায়, বিশেষতঃ যখন চোখে পড়ে "ইংরেজ পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে" রাখছে। সাম্রাজ্যবাদী লালসার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হবার ফলেই দেখা গেল দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনের ভয়াবহ রূপ, যা কবি-চেতনায় অবিরাম রক্ত-ক্ষরণ ঘটিয়ে চলে :

> "ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থ সাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি প্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলণ্ড কি রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলুম এই দূর থেকে।"(৮)

কিন্তু কোন পথে, কেমন করে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিক শোষণের চূড়ান্ত অবসান ঘটবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিতে না পারলেও এ বিশ্বাসে কবি নিশ্চিত ছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্ত সমাগত। তাই কবির আশি বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে রচিত, বৈশাখী উৎসবে পঠিত 'সভ্যতার সংকট'-এ যেন বুর্জোয়া ঔদার্যে লালিত কবির জীবনদর্শনের সংকট পরম সততায় বিধৃত। এখানে উল্লিখিত পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে মোহমুক্তি, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের প্রতি ব্যক্ত ঘৃণা, এশীয় জাতিদের প্রতি য়ুরোপীয়দের বিদ্বেষ এবং মানব-কল্যাণে ও মানব-মহিমায় চিরায়ত বিশ্বাস যেন দীর্ঘকালিন রাজনৈতিক চিন্তার ফলশ্রুতি। সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে স্বদেশের মৃতপ্রায় জনতার প্রতি অকপট মমত্ববোধ। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত 'সভ্যতার সংকট' যেন একটি আহত, রক্তাক্ত জীবনবৃত্তের গর্বিত,

দলিল, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে কবির জীবনব্যাপী 'বিশ্বাস-আদর্শ, দ্বিধা-সংকট-সংশয়ের পরিস্রুত ইতিহাস, যা তাঁর জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার এক সংহত মহাকাব্য। নিশ্চিত বিশ্বাসে শপথের গরিমা নিয়ে কবির ঘোষণা :

> “ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে !
>
> “কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।”(৮)

এই গর্বিত বিশ্বাস চেতনায় ধারণ করতে পেরেছিলেন বলেই মৃত্যুর দুই মাস পূর্বেও রক্তের অক্ষরে, আঘাতে-বেদনায় ক্ষতমুখী জীবনের রূপ দেখে দেখে বরাবরের মতোই বুঝে নিয়েছিলেন যে, এ জগৎ স্বপ্ন নয়, কঠিন বাস্তবতার রুক্ষ পাষাণে মোড়া এর সর্বাঙ্গ। এর সাথে সঙ্গতির কোন অভাব নেই বহু বৎসর পূর্বে যৌবনের প্রখর উত্তাপে ঘরছাড়া-দিক্‌হারা তরুণদের উদ্দেশে আত্মত্যাগের আহ্বানে :

> “ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে
> নহে প্রেয়সীর অশ্রুজল
> পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
> শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।”

আর সেই ডাক শুনে দুঃসাহসী তরুণের দল বেরিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি ঘরে ঘরে আরামের উষ্ণ শয্যাতল শূন্য করে দিয়ে। বীরের সেই রক্তস্রোত কখনো ব্যর্থ হবার নয়, ব্যর্থ হয়নি যে সেকথা বলাই বাহুল্য।

আমাদের বিশ্বাস রাবীন্দ্রিক শিল্পসৃষ্টি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের মধ্যেও তাঁর পরম অন্বিষ্টকে পায়নি বলেই ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে ধনবৈষম্যের অবসান কামনায় , সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায়, নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করার এবং তাদের শোষণমুক্তির ঘোষণায় ও

অনুরূপ কার্যক্রমে। শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতিতে বিশ্বাসী না হয়েও একমাত্র আপন মানবিক-চৈতন্য ও শৈল্পিক সততার সংগ্রামে তাঁর যাত্রাপথ এতদূর প্রসারিত হতে পেরেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ের প্রথম পাণ্ডুলিপির অংশ।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রসঙ্গ কথা-১', রচনাবলী-১০ম (১৩৪৮) : ৫৫৮
৩. 'অচলায়তন'-প্রকাশের পর এ সম্পর্কে যে তুমুল বিতর্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে ললিত কুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি, (অগ্রহায়ণ, ১৩১৮)
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাস্তব', রচনাবলী-২৩শ (১৩৫৪) : ৩৬৪
৫. ঐ; 'সভাপতির অভিভাষণ', ঐ : ৪৭৩--৪৭৪
৬. 'সাহিত্য সম্মিলন', ঐ : ৪৮৩, ৪৮৬
৭ ঐ 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', রচনাবলী—৩য় (১৩৬৩) : ৬১৬
৮ ঐ 'সভ্যতার সংকট', রচনাবলী-২৬শ (১৩৫৫) : ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৪০
৯. 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি, বিচিত্রা, (কার্তিক, ১৩৩৯) : ৪৯২
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ ও অরূপ', রচনাবলী-১৮শ (১৩৫১) : ৩৪২
১১ ঐ 'পল্লীপ্রকৃতি', রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৫৩৫
১২. ঐ 'লোকহিত', রচনাবলী-২৪শ (১৩৭৭) : ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮-২৬৯
১৩ ঐ 'চৌঠা আশ্বিন', রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৩০১
১৪. ঐ 'লড়াইয়ের মূল', রচনাবলী-২৪শ (১৩৭৭) : ২৭১, ২৭০
১৫ ঐ 'জন্মদিনে'-২২নং কবিতা, রচনাবলী-২৫শ (১৩৫৫) : ৯৪-৯৫
১৬ ঐ 'সমবায়নীতি', রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৪৭৬
১৭. ঐ 'জয়ধ্বনি', রচনাবলী-২৪শ (১৩৭৭) : ৫৫
১৮ ঐ 'সমবায়-১', রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৪৫৯

স্বদেশ ও সম্প্রদায় : উদার ভাষ্যে

স্বাদেশিকতার পটভূমিতে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো একটি উপকরণের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ সে সম্পর্কে সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের তুলনায় বিচক্ষণতা ও গভীরতর বাস্তবতায় আশ্রিত। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্ম বা সম্প্রদায়গত বিবেচনা যে রাজনৈতিক সংগঠন তথা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি প্রবল পরাক্রান্ত উপকরণ, এ দূরদৃষ্টি জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বাস্তব গুরুত্ব নিয়ে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ অধ্যায়ের আলোচনায় সুপরিস্ফুট হবে যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অথচ এ বিষয়ে এত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে আলোচনার শুরুতে রৈবিক ধর্মবোধের কিছুটা পরিচয় নিতে হয় আমাদের।

আমরা জানি বাল্যে রাবীন্দ্রিক ধর্মবোধের সূচনা পিতার ব্রহ্মতত্ত্ব তথা একেশ্বরবাদের সাথে পরিচয়ে, এবং তারুণ্যে রামমোহন রায়ের ধর্মীয় উদারতা ও মানবিক-চেতনার রসে এই বোধ বিশেষ ভাবে জারিত ও প্রভাবিত। এ সময়েই পৌত্তলিকতার বিসর্জনে ঠাকুরবাড়ীর ধর্মীয় ঔদার্য ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি রচিত হয়ে ছিলো। রবীন্দ্রনাথের দিদি সৌদামিনী দেবীর ভাষায় :

> “রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।”(১)

সম্ভবতঃ এই বিশেষ পরিবেশ ও প্রভাবের ফলে উত্তরকালে বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা তথা প্রতিমাপূজা সম্পর্কে অনাস্থা ও

বিরূপতা ব্যক্ত করে এ'কে সংকীর্ণ-চেতনার প্রতীক রূপে চিহ্নিত করেছেন ("মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন পাঁচসাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি")।(২) প্রসঙ্গতঃ রামমোহনের মূর্তিপূজা বর্জন এবং বিশ্বমানবিকতার ধর্ম সম্পর্কে কবির গভীর প্রশস্তি উল্লেখ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় আদর্শ নিছক একেশ্বরবাদেই সম্পূর্ণ নয়, বরং এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলো মানব-মহিমা ও মানব-কল্যাণের বিশ্বজনীন প্রভাব। সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত প্রভাবের একটি অন্যতম সূত্র বেন্থাম, মিল ও কোঁতের মানব-মৈত্রী এবং অনৈশ্বরিকতার আদর্শ ; যা সেকালের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়েছিলো ঃ

> "যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।"(৩)

এমনি করে বিচিত্র ও নানা বৈপরিত্যময় উপকরণের মিশ্র প্রভাবের মধ্যে কবির ধর্মবোধ রূপায়িত হয়েছিলো বলে তার চোখে ধর্মের প্রকৃতি যেমন বিশ্বজনীনতায় মূর্ত, তেমনি তা মানব-মৈত্রী ও কল্যাণের আদর্শে নিষিক্ত ; যা বিশেষ জাতীয় আচার, শাস্ত্র বা মূর্তি-কল্পনায় সীমাবদ্ধ ছিলোনা, বস্তুতঃ রৈবিক ধর্মের পরিচয় তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে এবং অনন্য স্বাতন্ত্র্যে ঃ

> "মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর-প্রাণের চেয়ে বড়ো-সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম।"(৪)

বিচিত্র এই বোধে উদ্বুদ্ধ কবির সংজ্ঞায় মানুষের মনুষ্যত্বই হচ্ছে তার ধর্ম। এই পরিচ্ছন্ন অনুভব অন্তরে ধারণ করে কবি নিশ্চিন্তে ঘোষণা করেন ঃ

> "আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই, সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠেনা। তার সঙ্গে কেবলমাত্র অভ্যাসের যোগ জন্মে।"(৪ক)

তাই আপন ধর্মবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলতে দ্বিধা করেননা যে, তাঁর ধর্ম "অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম নয়।"(৪খ) মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, দুঃখ-দ্বন্দ্ব আলোড়িত করে ক্রমশঃ এই নতুন বোধের অভ্যুদয় ঘটেছিলো, কবির নিজস্ব জবানীতে, বর্ষশেষ কবিতায় ব্যক্ত ঝড়ের উদ্দামতা নিয়ে—"চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিবনা বন্ধন-ক্রন্দন/হেরিব না দিক"(৪গ) ইত্যাদি বক্তব্যের শাক্ত-আবেগে। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য-পড়ে ছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতা মাত্র আমার ছিলনা। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচার-বিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্য দেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে, নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাত রূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোন চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিলনা। একথা বলার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে, তার উপর কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি।"(৫)

এই উদার পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্ধিত রবীন্দ্র-মানসের ধর্মের সংজ্ঞা স্বভাবতঃই সাধারণ সমাজ থেকে মেরুপ্রমাণ পৃথক হতে বাধ্য ; এবং বাস্তবে হয়েছিলো তাই, যা মোটা চোখের দৃষ্টিও এড়ায়না। এখানে মানুষ এবং তার কল্যাণ ও শান্তি ধর্মের প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষে দেখা যাবে যে মানুষ ও তার পূর্ণাবয়ব মহিমময় রূপ এবং বিশ্বমানবের পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব রবীন্দ্র-মানসের একমাত্র অন্বিষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

> "সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করেনা, সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত।"(৬)

অর্থাৎ মানুষে-মানুষে মিলন, কল্যাণ ও শান্তি রৈবিক ধর্মের উপজীব্য। তাই এমন ধর্মের রূপরেখা রবীন্দ্র-বলয়ে গ্রহণযোগ্য নয় যার লক্ষ্য "দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহ-ভাব স্থাপন করা"। ধর্মের এই সর্বজনীন রূপ রেখা প্রণয়নে প্রসঙ্গত কবি তিনজন মহাপুরুষের (বুদ্ধদেব, যিশু খ্রীষ্ট, হজরত মুহম্মদ) নাম উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর মতে

> "মানুষের ধর্মরাজ্যে সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"(৭)

ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, বাইরের বিধি নিষেধের অনুগত নয়। মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেমে এর যথার্থ প্রকাশ। বাস্তবিক এ যেন সমগ্র ভূখণ্ড তথা বিশ্বব্যাপী একটি মাত্র মানব-ধর্ম স্থাপন, যে স্বপ্ন উপমহাদেশের পরিধিতে দেখা গেছে সম্রাট আকবরের 'দীন-ঈ-এলাহী' নামক উদার ধর্মপ্রবর্তনার অভিলাষে, এবং যার ব্যবহারিক প্রয়োগ সেই মধ্যযুগের মতো একালেও সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ নয়। কবি-চেতনায় উদ্ভূত এই ইউটোপিয়ান তত্ত্বের বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, এই ধর্মতত্ত্ব নির্ভেজাল অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানের ধর্মও নয়, যা ছিলো তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের আরাধ্য ও সাধনার বিষয়। বরং মনে হয় পিতার অনুসৃত একেশ্বরবাদের সাথে নিশ্চিন্তে মিশেছিলো কবির মানব কল্যাণ ও বিশ্বজনীনতায় আশ্রিত আদর্শ, যা পরিস্রুত হয়ে রৈবিক মানসের কল্যাণী-ছায়া রূপে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন অঙ্গনে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বভাবতঃই ধর্মবিশ্বাসী রবীন্দ্র-বলয়ে সব ধর্মের অনুপ্রবেশ ছিলো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তাই সমাজে মানুষের যে ব্যক্তিক পরিচয় ধর্মদ্বারা চিহ্নিত (যেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) তাকে কবি মাথার উপরে অবস্থিত শিরোভূষণ বা পাগড়ীর সাথে তুলনা করেছেন। বাস্তবিক, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়, অনেকটা এ জাতীয় ভাবনায় আক্রান্ত হওয়ায় কবির প্রার্থনা ধার্মিক হবার আনুষ্ঠানিকতায় ধৃত হওয়া নয়, বরং মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি কাণ্ডের নয় শুধু, কর্মকাণ্ডের পেছনেও রয়েছে মানবিক চেতনা, শান্তি ও কল্যাণী আদর্শের নিঃশব্দ-প্রবাহী স্রোতোধারা। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলে বোঝা যাবে যে তাঁর ভক্তিমূলক

গানের বিশাল চত্বরে এই বিশিষ্ট বোধ রঙে রসে কারুকার্যময় হয়ে ওঠেছে, যার ফলে লোকায়তিক প্রেম-ধর্মের সুপ্রকাশ (যেমন: "তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ,...") ঘটিয়েও হৃদয়ে প্রত্যয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে যে "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে"। শুধু প্রবন্ধে বা গানেই নয়, কবিতায়ও একই উদ্দেশ্যের তুলিতে এঁকে তুলেছেন এই সর্বজনীন মানব-মহিমা বিধৃত ধর্মের বোধ, যা বিশেষভাবে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের বিশেষ কয়েকটি কবিতায় ('শুচি' 'স্নান সমাপন' 'রংরেজিনী' প্রভৃতি) গভীর ব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট। বুঝতে কষ্ট হয় না কেন বাউল ও অন্যান্য লোকায়তিক ধর্মধারার নায়কদের প্রতি কবির পক্ষপাত সুস্পষ্ট, বিশেষ করে যাদের চেতনার দাক্ষিণ্যে অন্ধ তমসার মধ্যে এমন সব দুয়ার খুলে যায় যেখানে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ দ্বিধাহীন সুরে বাজতে থাকে। এক কথায়, একদিকে যেমন একটি 'আন্তর্জাতিক' বা 'বিশ্বজনীন' ধর্মীয় আদর্শ তার মনে জেগে ওঠেছিলো, তেমনি অন্যদিকে জাতীয়তার ক্ষেত্রেও একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা বিশ্বজনীন জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যা অংশতঃ প্রতীক রূপে হলেও, তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

তাঁর আদর্শ-চিহ্নিত ধর্মবোধের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ষ্টপফোর্ড ব্রুকের উল্লেখ এনে বলতে চেয়েছেন যে,

> "ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখানে থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে।"(৮)

কবির মতে জ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের চর্চায় ও আস্বাদে যেমন সর্বজনীন বোধ ও বিশ্বজনীনতা পরিস্ফুট, তেমনি মোহমুক্তিজনিত উদার ক্ষেত্রের পরিসর চাই ধর্মের বেলায়ও। বিশেষ করে আধুনিক কালে যাতায়াত-ঘটিত উন্নতির কারণে পৃথিবীর মানুষ একে অন্যের প্রতিবেশী; এবং মানুষে মানুষে নৈকট্যের ফলশ্রুতি অই সর্বজনীন বোধ সৃষ্টির পরম অনুকূল:

> "মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশী করে অনুভব করছে।...পশ্চিম দেশে যারা মনীষী তারা নিজের ধর্ম-সংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক্।"(৮)

ধর্ম-বোধের এমনি একটি আদর্শ অন্তরে বহন করার ফলেই প্রচলিত ধর্মের অন্ধতার ও সংকীর্ণতার প্রতি বার বার তর্জনি নির্দেশ করেছেন কবি, যাতে ধর্ম মানুষে-মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলতে না পারে :

> “আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র করে সংকীর্ণ ক'রে তার মানব ধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।”(৯)

আর ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি সমাজ ও জাতির সর্বক্ষেত্রে, এমন কি ব্যক্তিক পরিধিতেও বিষাক্ত সর্বনাশ ডেকে আনছে, সে সম্পর্কে কবির অনুভব ছিলো খুবই স্পষ্ট :

> “মানুষের ধর্ম সকলকে এক করবে, এইতো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে ; কত অন্যায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে।”(৯)

তাই শান্তিনিকেতন-এর আদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি সুস্পষ্ট ভাষায় জানালেন : “এখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ, জাতিভেদ ভুলব।” (অবশ্য এই রৈবিক আদর্শ কতোটুকু সফল হয়েছে, সময় তার বিচার করবে।)

কবির এই উল্লিখিত ধর্ম-চেতনার কক্ষে মানবিক-বোধের পরিপূর্ণ মিশ্রণ এবং প্রাধান্যের ফলেই তাঁর সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির স্বচ্ছ পরিসীমায় ধরা পড়ে ছিলো উপমহাদেশের পথে পথে ধর্মীয় অন্ধকারের বেড়াজাল, যা থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাক্‌, বুদ্ধিজীবী বা জাতীয়তাবাদী আদর্শও মুক্তি পাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের এই উদার মানবিক চেতনার সাথে যুক্ত হয়েছিলো রাজনৈতিক বিচক্ষণতা—যার ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি ও জাতীয় আন্দোলনের খণ্ড চরিত্র, এবং এসবের নিহিত কারণ তাঁর চোখে সন্দেহাতীত পরিপূর্ণতায় ধরা পড়েছিলো। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এদেশের প্রকৃত মুক্তি রাষ্ট্রীয়-আন্দোলনের সার্বিকতায় তথা হিন্দু-মুসলমানের বাস্তব ঐক্যে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদের কালাপানি প্রবল বিস্তৃতি ও গভীরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে, সে সত্য আর কারো চোখে না পড়লেও রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন, আর এই রূঢ় সত্য ও তার নিহিত কারণ সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রবন্ধাবলীর

বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে। অনৈক্যের গভীরে উৎস সন্ধানে কবি তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন নিশ্চিত আন্তরিকতায়, এবং সে কাজে প্রথমেই সত্য-সন্ধানী গবেষকের মতো উপমহাদেশের বৃহত্তর সম্প্রদায় তথা স্বীয় সম্প্রদায়ের পরিসীমায় বিশ্লেষী মনন নিক্ষেপ করেছেন :

> "ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায়না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্য কৃচ্ছ্র সাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার বিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে।...
>
> "বর্তমান হিন্দু সমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে পৃথক করে রেখেছে। হিন্দু ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলই বেড়া এবং প্রাচীর।"(১০)

বস্তুতঃ এই মানবতাবাদী কবি ধর্মের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী থেকে উৎসারিত মানব-ঘৃণা, নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা, রূঢ় অমানবিকতার প্রতি সুতীব্র বাক্যের কশাঘাত করেছেন ; বিশেষ করে অন্য-সম্প্রদায়ের প্রতি, বিদেশীদের প্রতি, এমনকি অন্ত্যজ আপন সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ব্যবহারের জন্য। এ প্রসঙ্গে পাড়্‌গা'র রাস্তায় একজন বিদেশীর ঔষধ, আশ্রয় ও সেবার অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তেমনি :

> "পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করেনা, তাহাদের ধান কাটেনা, তাহাদের ঘর তৈরী করিয়া দেয়না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে। আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নীচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।"(১১)

ধর্ম ও ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলতার বিষয়টি প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি কবি, একে "সামাজিক পাপ" বলে গণ্য করেছেন তিনি :

> "হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে।... আমরা এক ভাষায় কথা কই, একই সুখ-দুঃখে মানুষ ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।...

> "আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাসে হিন্দু-মুসলমান বসেনা—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।...
> "মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।"(১২)

ধর্মীয় সংকীর্ণতার সামাজিক রক্ষণশীলতায় রূপান্তর-গ্রহণ কবির চোখে আরো ভয়াবহ পরিণাম সম্পন্ন প্রতীকে ধৃত হয়েছে। অনাবেগ বিশ্লেষণে এর কারণ প্রতিভাত হয়েছে ঃ

> "হিন্দু সমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্য পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারেনি।... ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলতো খৃস্টান তাহলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা ঠোকাঠুকি বেধে যেতো। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান।"(১৩)

এর ফলাফল শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও যে মারাত্মক সে তথ্য রবীন্দ্রনাথ বহুবার সভা-সমিতিতে, রাজনৈতিক মঞ্চে এবং প্রধানতঃ তাঁর প্রবন্ধাবলীতে তুলে ধরেছেন, আবেদন জানিয়েছেন যাতে বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা হয়। কারণ, তাঁর মতে সমস্যাটি তার গুরুত্ব-পূর্ণ বিন্দুতে বিশ্লেষিত হচ্ছেনা, যার ফলে তীর্থযাত্রী 'এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় প্রচণ্ড অমিলটা' পর্যবেক্ষণ করা এবং তাকে মিলের সাযুজ্যে গতিবেগ সম্পন্ন করে তোলার কোন প্রচেষ্টাই নেই। জননায়কদের বিচক্ষণতার অভাব রৈবিক মানসকে শুধু যে পীড়িত করেছে তাই নয়, ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে ঃ

> "যে দেশে প্রধানতঃ ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারেনা, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে

> ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে।"(১৩)

অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলন, স্বরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নটি বিচার করতে গিয়ে কবি এখানেও সেই বহু-কথিত মানব সম্পর্ক ও মানব-কল্যাণের ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তার আলোকে পরিস্ফুট ধর্মবোধের মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজেছেন। তাই প্রচলিত ধর্ম-চেতনা ও আচরণ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি, যা আগেই আমরা দেখতে পেয়েছি। এমন কি উপরে উদধৃত বক্তব্যের সাত বছর পরে লেখা কবিতায়ও (মৃত্যুর বছর তিনেক আগে লেখা) তিনি একই চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্ম-আচরণের বাহ্য-আড়ম্বরের পেছনে সঞ্চিত হিংসা, দ্বেষ ও লোভে যে স্ববিরোধিতার প্রকাশ তার মধ্যে কল্যাণের কোন স্পর্শ দেখতে পাননি কবি ঃ

"ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
স্তুপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্র মন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।" ('প্রায়শ্চিত্ত' ঃ নবজাতক, ১৩৪৫)

কবি জানেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে ধর্মের এই আচরণ বিধাতার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তাই অভিশাপ গ্রস্ত এদেশে

"ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নতুন জীবন নতুন আলোকে
জাগিবে নতুন দেশে।" ('প্রায়শ্চিত্ত': নবজাতক)

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটির ক্ষেত্রে কবির বিশদ আগ্রহ ও বিশ্লেষণ তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছিলো যে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সমাধানের পথ অত্যন্ত দুর্গম ; কেননা 'ভেদটা শ্রেণীগত নয়, জাতিগত'। আর ধর্ম জাতি-পরিচয়ের ভ্রান্ত চিহ্ন বহন করে আছে। তাই

> "আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায়না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে ; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায়না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে। ধর্মই তাদের মানব বিশ্বকে সাদা কালো বলে ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে—আত্ম ও পর।"(১৪)

এমনি একটা অসহ অবস্থা কবি-হৃদয়ে যে তীব্র ঝড়ের সৃষ্টি করেছিলো, তারই প্রেক্ষিতে কবি আপন সম্প্রদায়কে ব্যবচ্ছেদ করেছেন অধিকতর শক্ত হাতে, কালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে তার পরিচয় মেলে :

> “হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।...হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিলো। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।”(১৫)

এরপরও রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, এবং যত ভেবেছেন ততই ক্ষুব্ধ ও রক্তাক্ত হয়ে ওঠেছেন। কারণ, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে •

> “ধর্ম-নিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে।...বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে ; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।”(১৬)

এই দুঃখজনক পরিস্থিতি রবীন্দ্রমানসে আঘাতে আঘাতে এমনি রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছিলো যে ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও শেষ পর্যন্ত বলিষ্ঠ সততায় সচেতন মননের হাত ধরে কবি বিশ্বব্যাপী ধর্মের এই নেতিবাচক দিকটি (বিশেষ করে জাতীয়তার ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক প্রশ্নে) নির্মোহ মানসিকতায় উদ্ঘাটিত করেছেন :

> “ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে, তার সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার ফরাসী বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।
>
> “নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করেনি, কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে।”(১৩)

এর কারণ, ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ পরবর্তীকালে ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষদের বাণীকে বিকৃত করেছে সংকীর্ণ করেছে ; আর

> “সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে, এমন বিষয় বুদ্ধি দিয়েও নয় ; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খৃষ্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই।...
>
> “আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে-দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে একদেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।”(১৩)

মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ-চেতনা সৃষ্টিতে যে ধর্ম-উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক-চেতনার প্রবল ভূমিকা, সেই রূঢ় সত্য স্বীকার করে নেয়া ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ খোলা রইলোনা রবীন্দ্র-মানসে। উপমহাদেশে সম্প্রদায়গত পরিবেশের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি আচ্ছন্নকারী ধর্ম-প্রভাব তাঁকে ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছিলো, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি আশ্চর্য নির্ভুলতায় ধর্ম-সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বের সমান্তরাল। বিশেষ করে এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছিলো রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের কর্মকাণ্ড দেখে ঃ

> “যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ-প্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে ; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। এ-পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।”(১৭)

দেশ জাতি জাতীয়তা ও রাজনীতিক্ষেত্রে রাজতন্ত্রসহায়ক ধর্মের প্রবল প্রক্ষেপ রবীন্দ্রনাথকে শুধু ভাবিয়ে তোলেনি, ক্ষুব্ধতিক্ততা এনে দিয়েছিলো চিত্তে, যার ফলে ১৯৩০ সালে সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় ধর্ম-উৎপাটনের প্রশ্নে অবলীলায় ঘোষণা করেছিলেন ঃ

> "সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। **ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল, দেশের** উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।"(১৭)

হয়তো বা গভীর বেদনার সাথে ধর্ম-প্রভাব সম্পর্কে কবির অদ্ভুত মোহমুক্তি তাঁকে উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বাস্তব চেহারা ও তার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করে তুলেছিলো, যা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই সমস্যা সমাধানের দায় তিনি তৃতীয় পক্ষ বা দ্বিতীয় পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাননি। তাঁর দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা তাঁকে দেখতে সাহায্য করেছিলো যে ভেদবুদ্ধির কারণে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সাথে মিলতে পারছে না প্রাণ খুলে, এবং ইংরেজের ভেদবুদ্ধি ও কলকাঠির বাইরেও এটা ঘটছে। এ সমস্যাকে স্বীকার করে নিয়েই তবে এর সমাধান সম্ভব, আর সমাধানের প্রয়োজনেই এর অন্তর্নিহিত কারণগুলোর যথাযথ স্বরূপ নির্ধারণ প্রয়োজন। সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়েই কবি সিদ্ধান্তে এলেন যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে উভয়ের ধর্ম-বিরোধই নয়, তার মূল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের গভীরে নিহিত। কংগ্রেস-নেতৃত্বের অনুসৃত ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক মিলন (রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে) কবির কাছে বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কারণ, কবি দেখতে পেয়েছিলেন যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিধিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর—কালাপানির দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষ, যা জোড়াতালি বা গরজের উত্তাপে দূর হবার নয়। এর জন্য চাই সমস্যার গভীরে খনন ও অবরোহণ এবং মূলগত সমস্যার উৎপাটন। খিলাফত আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির সাময়িক ঐক্য এবং পরে স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ, বিলাতী পণ্য-বর্জন, স্বতন্ত্র নির্বাচন, বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে উভয় সম্প্রদায়ের অনৈক্য এবং পরস্পর-বিরোধিতা প্রভৃতি বিচার করেই রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে "দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিল মাত্র।" এতে সত্যিকার মুক্তির উপায় নিহিত নেই। কবির বিচারে এই অনৈক্য বিদূরণের পথ সার্বিক মিলন ও ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে—অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও

সর্বমাত্রিক ঐক্য, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য (হয়তো বা ঐক্যও) রূপায়িত হতে পারে।

সম্ভবতঃ একারণেই কবি সামাজিক বৃত্তে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য (আপাত দৃষ্টে যত ছোটই হউক) উপেক্ষা করেননি। কারণ নৈকট্যের অভাব, আচারে দূরত্ব অনৈক্যের কাঁটা তীক্ষ্ণ করে তোলে (প্রসঙ্গতঃ তিনি গ্রেট ইষ্টার্ণের ভাত খেতে কিংবা মুসলমানের সাথে একই চালের নীচে পানি খেতে শিক্ষিত হিন্দুর আপত্তি ইত্যাদি বহুতর বিষয় অবতারণা করতে দ্বিধা করেননি)। নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন যে সাধনা ছাড়া, সত্যিকার আন্তরিকতা ছাড়া শুধুমাত্র বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাক দিলেই অনৈক্যের কালাপানি পার হওয়া যায় না। অবশ্য কবি একথাও আশা করেননি যে আমাদের ‘দেশে ধর্ম-কর্মের ও মতবিশ্বাসের পার্থক্য সহজেই ঘুচে যাবে।’ তবু তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে মনুষ্যত্বের খাতিরে এবং সদিচ্ছার অভাব না ঘটলে ঐক্যের পথ ক্রমশঃ মসৃণ করে তোলা সম্ভব :

> “পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকেই আজকাল হিন্দুমুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকে বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্য যেন লজ্জা স্বীকার করি।”(১৩)

প্রসঙ্গতঃ কবি তাদের জমিদারি সেরেস্তায় ব্রাহ্মণ-ম্যানেজারের মুসলমান-প্রজাদের জন্য জাজিম তুলে বসবার ব্যবস্থা করার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ধিক্কারের সাথে। সম্ভবতঃ ঘটনাটি অল্পবয়সী কবি-চিত্তে এমনি ছাপ রেখেছিলো যে বিষয়টি তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বহুবার উল্লেখ করেছেন। এই মানসিক কৃপণতা ও সংকীর্ণতাকে তিনি অনৈক্যের দায়ভাগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে

> “এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে ; অবশেষে এমন হয়েছে, যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ ; যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেছে তার মূলে তো

> এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে আমরা যখন অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখিনা কেন।"(১৩)

অর্থাৎ সামাজিক অনৈক্যের পথ ধরে কবি রাজনৈতিক বিরোধের মূল সূত্রটি তুলে ধরলেন। এবং বিস্ময়কর বাস্তববোধের পরিচয় দিলেন নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর মতামতের মাধ্যমে। এই প্রজ্ঞাই বুঝতে সাহায্য করেছিলো, কেন বিদেশী পণ্য বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলনে অধিকাংশ অশিক্ষিত মুসলমান হিন্দু-বাঙালীর তেমন সহযোগিতা করেনি।(১৮) এ সম্পর্কে কবির বিশ্লেষণ অনেকটা শল্যবিদের মতো ঃ

> "যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ-দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া চড়া দামে জিনিষ কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী' প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু 'চাষা' ঠিক বুঝিয়াছিল।"(১২)

সচেতন পাঠকের মনে হতে পারে যে কবি এক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনার পরিচয় রেখেছেন, কিন্তু তা নয়। এক্ষেত্রে কবির বিশ্লেষণ মানব-সম্বন্ধ ও কল্যাণী ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভিত্তি করেই সম্পন্ন ; অবশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির দূরদর্শিতা এবং সমস্যার গভীরে সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে অবতরণের প্রচেষ্টা। সত্য ও বাস্তবকে অনুধাবন করার আন্তরিক তাগিদে যে রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, তা কবি-মানসের সততার পরিচায়ক। জাতীয় আন্দোলন যে বুদ্ধিজীবী তথা উচ্চশ্রেণীর স্বার্থবাহক, শ্রেণী-চেতনার বৃত্তে প্রবেশ না করেও, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ে কবি বারবার প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তেমনি চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন ঃ

> "ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। একথা তাহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের বা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনো

> দিন দিই নাই। অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না।"(১৯)

অবশ্য মুসলমান চাষীরা যে শ্রেণী-চেতনার বশবর্তী হয়ে উল্লিখিত স্বরাজ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলো, তা নয়। এর কারণ বিবিধ : প্রথমতঃ ধর্মগত বিভেদ, দ্বিতীয়তঃ জাতীয় নেতৃত্বের খণ্ড চরিত্র এবং সেই প্রেক্ষিতে মুসলমান কৃষকদের উক্ত নেতৃত্বে অনাস্থা ; তৃতীয়তঃ ইংরেজ-শাসকের ভেদবুদ্ধির প্রভাব। তাই সমস্যার অতি-সরলীকরণ বা সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিলো আন্তরিক। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের আরো একটি অতিবাস্তব কারণের দিকে তর্জনী নির্দেশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা উভয়ের মধ্যে বৈষম্যের প্রধান কারণ। পরবর্তীকালে অগ্রসর চেতনার পরিবেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার যে অর্থনৈতিক দিকটা আমরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভব করেছি, সেকালে বিশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, শুধু মাত্র বিচক্ষণতা ও মানবিক-চেতনার পথ ধরে। তাই অনায়াসে সচেতন কবি-কর্মীর মত তিনি বলতে পেরেছেন পাবনা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে :

> "আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন, তবে আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।"(২০)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য যে মুসলমান সম্প্রদায়ের দূরে সরে থাকার এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাসের কারণ, একথা তিনি বার বার বিশেষ জোরের সাথে নেতাদের বোঝাতে চেয়েছেন. বুঝতে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষিত হিন্দু সমাজকে। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এহেন রাজনৈতিক বোধ ও প্রজ্ঞা যেন অবিশ্বাস্য :

> "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না! আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই, তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না।...
> "মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অংক বেশী হইবে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কিনা, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসঙ্গত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে লাভ।"(২১)

শিল্পীর এই সততা চেতনায় ধারণ করেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন একটি অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ সম্ভব হয়েছিলো, যা রাজনৈতিক অঙ্গনে একাধারে প্রতিক্রিয়া ও উপেক্ষা কুড়িয়েছে, কিন্তু তাতে ক্ষান্ত হননি কবি। সত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে খিলাফৎ ও স্বদেশী আন্দোলনের সন্ধি-বন্ধন যে 'কাঁচা ভিতকে মালমশলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত মত চাপা দেওয়া' একথা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন, এবং তাঁর বিশ্বাস সপ্রমাণ হতে বেশী সময় লাগেনি। তাই তাঁর সমাধানের পদ্ধতি ছিলো সমাজ-বিজ্ঞানীর মতো ভিত্ ধরে নাড়া দেওয়া। কারণ, তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নতি মুসলমানদের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় যা উভয় সম্প্রদায়ের সমতা তথা রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করবে ঃ

> "আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারত-বর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে (সমগ্র ভারতের তুলনায় বাংলার মুসলমান আরো অনেক বেশী— বন্ধনীস্থ বাক্য লেখকের)। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশী দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মানশিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।...
> "আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন-সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।...

> "পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয়, ইহাই যেন আমরা প্রসন্ন মনে কামনা করি।"(২১ক)

মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অতিদ্রুত, প্রয়োজন মতো বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহারে হিন্দুর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারলেই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যের প্রতিবন্ধকতা দূর হতে পারে, এ বিশ্বাস বুকে নিয়েই কবি স্বাতন্ত্র্যের পক্ষ সমর্থন করেছেন নির্দ্বিধায়। কারণ তিনি জানতেন উপবাসী পেট ঐক্যের ডাকে সাড়া দেয় না :

> "আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্‌যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।"(২১ ক)

যিনি জাতীয়তাবাদের উগ্রতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি, তাঁর পক্ষে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধিতা মনে হতে পারে, কিন্তু এই বিচক্ষণ দার্শনিক-কবি জানতেন যে সাম্য শুধু শ্রেণীর বেলায়ই নয়, সম্প্রদায়ের বেলায়ও ঐক্যবদ্ধ চলার পথে গতিবেগ সঞ্চারের এক অপরিহার্য সর্ত। জাতীয়তার পূর্ণাবয়ব পরিবর্ধনের পথে সত্যিকার আন্তর্জাতিকতায় উত্তীর্ণ হবার মতোই সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণতার মাধ্যমে বৃহত্তর বৃত্তে, বৃহত্তর স্বার্থে স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডি তথা বেড়াজাল অতিক্রমণ সম্ভব—এই বিশ্বাসেই স্থিত ছিলেন কবি, ইচ্ছা-পূরণ মন্ত্রে নয়। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে আরো একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার উপর (জাতি, সম্প্রদায়, ব্যক্তি প্রভৃতি ব্যাপক ক্ষেত্রেই) অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বিশেষ করে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের উন্নতির ক্ষেত্রে। রাশিয়া ভ্রমণের পর এ বিশ্বাস তার আরো বদ্ধমূল হয়েছিলো। তাই অনগ্রসর মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে এ স্বাতন্ত্র্যের পথ তাঁর চোখে ছিলো আরোহণের পথ, যাতে করে শিক্ষার আলোকে, হৃদয়ের ঔদার্যে, মননের আভায় উভয় সম্প্রদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। সম্ভবতঃ এ কারণেই তিনি মুসলমানের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার মেনে নেবার, এমন কি বঙ্গ-

ভঙ্গ সম্পর্কেও সহিষ্ণু হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন হিন্দু সমাজের রাজনীতি-সচেতন অংশের কাছে।

সমাজ ও রাজনীতির মতো সাংস্কৃতিক বস্তুতেও এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিলো। তাই বিভিন্ন পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাঁর চোখে 'সাধনা'র বস্তু, যা মনের পরিবর্তনের, যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু মনে হয়না, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সেকালে বিষয়টিকে এতোখানি গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলো। তবু কবি দ্বিধা করেন নি, ডাক পাঠিয়েছেন অগ্রসরতর হিন্দু সমাজের প্রতি :

> “নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তাহলেই দেখতে পাব মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ।”(১৩)

প্রসঙ্গতঃ তিনি তাঁর 'শান্তিনিকেতনের' মুসলমান শিক্ষক-ছাত্রদের সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক এবং তাঁর মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের কথা উল্লেখ করে এ কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে ঐক্যলাভে উদ্দেশ্যের সততা ও আন্তরিকতা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে তাঁর আরো একটি সর্ত হোল স্বার্থবুদ্ধির নিরসন, কারণ স্বার্থবুদ্ধি ভেদবুদ্ধির প্রসারের সহায়ক মাত্র। মনের মিল ও প্রাণের মিলে রাস্তাটাকে মসৃণ করার উদ্দেশ্যে কবি চোখ রেখেছিলেন চারদিকে ; অর্থনীতিও সেখানে পরিত্যক্ত হয়নি ; জীবিকার ক্ষেত্রে মিলের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন তিনি :

> “জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সবচেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে।”(২২)

এমনি করে একটা ব্যাপক কর্মসূচীর ও আদর্শের ভিত্তিতে কবি চেয়েছিলেন উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করা ; ধর্মীয় আচার-আচরণের তীব্রতার ওপরে মানবিক মূল্যবোধ ও সহিষ্ণুতার স্থান দেওয়া—যেসবের শুভফল সম্পর্কে তিনি বরাবর আস্থাবান ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো বিভেদের কাঁটাগুলো সুশিক্ষার মাধ্যমে অপসারিত করা, যাতে কুরে

মিলনের উৎসমুখ মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতির সর্বাঙ্গীন সাধনার উদ্দেশ্য হবে মানুষে মানুষে মিলন, এবং তার ভিত্তি হবে—বিদ্বেষ নয়, প্রেম। তাই প্রয়োজন স্ব-স্ব পরিচয়ের পূর্ণতার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ একক পরিচয়ের পূর্ণতা ঃ

> “ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক। বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্ব সমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন, তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তীয়, ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষা-সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণের বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষা-স্থানের প্রতিষ্ঠা হয়নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।”(২৩)

সমাধানের পথ ও তার রূপরেখা এমনি করেই চিহ্নিত করে চলেছিলেন কবি যাতে মিলনের বিষয়টি বাস্তবতার পোষক রসে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এমন কি প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যেও শেষ বয়সে রাশিয়ায় মুসলমানদের দেখে তিনি আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মন বলেছিলো ঃ হবে, হবে। তাই আপাত-প্রয়োজনের সাথেও রফা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন, যা ছিলো পূর্বাপর তাঁর স্বভাব-বিরোধী ঃ

> “উপস্থিত কাজ উদ্ধারের খাতিরে নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট হয়তো হোক, তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিকবে না। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।”(১৩)

আর মিলনের প্রেক্ষিত হতে হবে ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ; তারপর রাষ্ট্রীয় জীবন। সেজন্য চাই ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও দানের মনোভাব ঃ

> “নিজের ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচার-প্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিত সাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল

> যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।"(২৪)

সামাজিক রীতিনীতি আচার-আচরণ তাই কম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নয়, যেখানে হিন্দুমুসলমানের নৈকট্য মানব-ধর্ম ও হৃদয়বৃত্তির উত্তাপে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে ; কারণ দূরত্ব অপসারণ এবং দূরকে নিকট করাই, তাঁর মতে, ধর্মের কর্মকাণ্ডের সীমানা। আর প্রকৃতিগত দিক থেকে মানুষ মানুষকে কাছে টানে, পরস্পরকে কাছে পেতে চায় যদি না কোনো কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সামনে এসে দাঁড়ায়। হয়তো এজন্যই কবি মানবধর্মকে মানব-স্বভাবের সাথে সমীকরণে সিদ্ধ করেছেন। প্রকৃতিগত আচারকে তিনি বরাবর ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে অনেক উপরে স্থাপন করেছেন ঃ

> "বস্তুতঃ ঘরের মানুষকে আপন ব'লে এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের ব'লে এবং তারও বাইরের মানুষকে মানব সমাজের ব'লে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।"(২৫)

শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবন বা সমাজ জীবনেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই সেতু বন্ধনের কাজ উজ্জ্বল হয়ে ওঠতে পারে ভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়—অন্ততঃ তাই তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন। তাঁর পারশ্য ভ্রমণের ইতিবৃত্তেও আমরা দেখতে পাই একই মনোভঙ্গি যে সাহিত্য সাধনায় ধর্মীয় প্রভেদ একেবারেই অপাংক্তেয়। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে এই বিশেষ সমস্যা জটিল বলয়ে রাবীন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি বলিষ্ঠ ; এমন কি এক্ষেত্রে উর্দুর প্রক্ষেপও কবি বেশ সুতীক্ষ্ণ যুক্তির শরসন্ধানে প্রতিহত করেছেন (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তাঁর মৃত্যুর এক দশকের মধ্যেই নতুনতর পরিবেশে বাঙালী মুসলমানের কাঁধে উর্দুর পুনরাক্রমণ আমরা দেখতে পেয়েছি, যে সম্পর্কে কবি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন) ঃ

> "বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয় তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে কেহ বলে না যে চীনাভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে।"(২৬)

তাই বাংলা ভাষা চর্চার মাধ্যমেই বাঙালী মুসলমানের প্রতিভার যেমন বিকাশ ঘটবে তেমনি "তাহাদের মুসলমানত্বও প্রকাশ" পেতে পারে :

> "শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাতে তাহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলা ভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কমতি নাই। যখন প্রতিদিন মেহনত করিয়া আমরা হয়রান হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছু কমতি ঘটে ?
> "স্পষ্ট দেখা যাইতেছে বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ আছে। কিন্তু দুই তরফের কেহই একথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র আজো প্রস্তুত হয় নাই।
> "বাংলাদেশে সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে।...
> "সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই।"(২৬)

এমনি করে কবি শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের অঙ্গনে এসে পেঁৗছলেন হিন্দু-মুসলমানের "মিলন যজ্ঞের আয়োজনে"। কিন্তু এখানেও রক্ষণশীলদের আঘাত এসে সৃষ্টির পসরা বিনষ্ট করতে দ্বিধা করেনি। কারণ :

> "ভেদ বুদ্ধি সহজে মরিতে চায়না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস।...কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকু কেও বজায় রাখিতে দিল না।"(২)

বস্তুতঃ বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ভেদবুদ্ধির অচলায়তনের ইটগুলো খসে পড়তে লাগলো ; বোঝা গেলো যে কোন বস্তুই নিজের বিশেষ পরিসীমায় একক এবং স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত নয়। এই বিশাল বিশ্বগোষ্ঠীর বিস্তারে গোত্র সকলেরই এক। কিন্তু তবু দীর্ঘসময়ের অভ্যাস যে অস্থিমজ্জায় আঁকা। তাই কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে

> "তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই, থাকিতেই পারেনা। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল, অলংঘ্য ব্যবধান।"(২)

এমনি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে কবির হৃদয় থেকে এতই রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল যে বিদেশে গিয়েও তিনি ভুলতে পারেন না স্বদেশের কলঙ্কিত এই

অধ্যায়টির কথা। পারসিক কবি হাফিজের সমাধিতে গিয়েও তাঁর মনে এই সমস্যাই বার বার দোলা দিতে থাকে, তাঁর মন প্রার্থনার সুরে বলতে থাকে : "ধর্ম নামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।"(২৭)

সম্প্রদায়গত ঐক্যের বাস্তব পথ নির্মাণে সংস্কৃতি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন সফর-রত 'বেঙ্গল স্টুডেন্টস ফেডারেশানের' সদস্যদের নিকট (১২·৩·৩৭ তারিখে) কবির বক্তব্যে। এই সংস্থার সম্পাদক শামসুর রহমানের বিবৃতিতে জানা যায় যে কবি বলেন :

> "যদি মুসলিম ছাত্র ফেডারেশান মাঝে মাঝে এরকম পরিভ্রমণকারী ছাত্রদল লইয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া একটি সাংস্কৃতিক ভাবধারার সৃষ্টি করেন, তবে তাহাতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।"

সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আরো বলেন :

> "যদি আমার দ্বারা এই সমস্যার সমাধানে কোনোরূপ সাহায্য হয়, আমি উহা করিতে সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি। তোমরা কাজে অগ্রসর হও। দেশ রইলো, আর রইলে তোমরা—দেশের ভবিষ্যত আশা-ভরসা। আশা করি, ভারত তোমাদের হাতে নবজীবন লাভ করুক।"

বলা বাহুল্য সম্প্রদায়গত বিরোধ ও বিদ্বেষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কবি-চেতনায় এমন এক স্পর্শকাতর বিন্দুতে উপস্থিত ছিলো যে জীবন-সায়াহ্নেও রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্জন করতে পারেননি। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণেও বিষয়টির উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি কবি :

> "সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ পেলো, বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণ-বোধে।"

তৎকালীন বাঙলায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার ক্রম-অবনতির মধ্যে স্যার আবদুল হালিম গজনবী ও বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক গৃহিত সাম্প্রদায়িক মীমাংসার উদ্যোগে সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করে ৮ই জানুয়ারী (১৯৩৭)

রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

> "এই মীমাংসা প্রচেষ্টার হোতারা যে সদ্বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, আমি তাহার প্রশংসা করিতেছি। যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দিনের পর দিন কুৎসিৎ ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছে, এই মীমাংসার মনোবৃত্তি তাহার উপশমে সাহায্য করিবে"...ইত্যাদি।

কিন্তু এমন সর্বতোমুখী প্রচেষ্টার ও আন্তরিকতার মুখেও রবীন্দ্রনাথের বহু কাঙ্ক্ষিত সর্বজনীন ধর্মাদর্শ যেমন মানবিকতার সার্বিক গুণগ্রাম সত্ত্বেও সাধারণ্যে গৃহীত হয়নি, তেমনি তাঁর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তৈরি হয়নি সর্বজনগ্রাহ্য, সর্বসম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য জাতীয় গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রাদর্শ। এ ব্যর্থতার দায়ভাগ অবশ্য প্রধানতঃ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ; কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সক্রিয় মানুষ ছিলেন না (বলাবাহুল্য এ দিকটিও রাবীন্দ্রিক জীবনের সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা)। তবু বিচিত্র ভাবধারার স্রোতে পরিপুষ্ট এই কবি কী সামাজিক, কী রাষ্ট্রীয় সমস্যায় নির্বাক ভূমিকা পালন করেন নি ; বরং উচ্চ কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে তাঁর বক্তব্য—কখনো ধিককারে, কখনো উপদেশে, কখনো বা সজোর অভিমতে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অঙ্গনে বাঙালী মুসলমানের পশ্চাদবর্তীতা, জাতীয় সংগ্রামের পটভূমিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুদারতার তথা একদেশদর্শিতার অভিক্ষেপ, শাসক ইংরাজ কর্তৃক অনুসৃত ভেদবুদ্ধির নীতি প্রভৃতি জটিল উপকরণের প্রভাব রাবীন্দ্রিক আদর্শের তথা আকাঙ্ক্ষার বাগান তছনছ করে দিয়েছে, বিনষ্ট করে দিয়েছে মানবমৈত্রীর বলয়ে কবির স্বপ্ন-পূরণের প্রত্যাশা। যে দেশে ধর্মের সর্বগ্রাসী বিপুলা প্রভাব সেখানে ধর্মকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা কাঠামো গড়ে তুলতে চাননি কবি, চাননি ধর্মহীন পথে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান। তিনি জানতেন, এ কাজ অসম্ভব। তার ধর্মচেতনার প্রধান ভিত্তি ছিলো মানবিক মূল্যবোধের সুতীব্র ঝলসানি, যা সজীব হয়ে ওঠবে প্রচলিত ধর্মগত আচার-আচরণের ঊর্ধ্বে। বস্তুতঃ এই রাবীন্দ্রিক ধর্মবোধ একান্তভাবেই তাঁর কবি চিত্তের মানবিক প্রত্যয়জাত ফসল, যা হয়তো বা সাধারণের চোখে প্রচলিত ধর্মের সমান্তরাল রূপ নিয়ে ধরা দেয়নি। তাঁর ধর্মচেতনার চেহারা নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যবোধে জারিত, এবং তাঁর বিজ্ঞান-দর্শন

তত্ত্বের আলোয় উদ্ভাসিত :

> "আধুনিক পৃথিবীতে পুরাতন ধর্মের সহিত নতুন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে ; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই ; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক, যে ধর্ম কোনোদিকেই তাহাকে বাধা দিবেনা।"(২)

বলা বাহুল্য, এ দেশে এমন কোন ধর্মবোধ কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। কারণ, এ তো প্রাত্যহিক আচরণের কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙ্গে মানুষের মধ্যেকার দূরত্বের বিনাশ ঘটিয়ে মানুষে -মানুষে মিলনের লক্ষ্যে এই রৈবিক ধর্মের মূল কথা মানবপ্রেম। কিন্তু এদেশে এখনো আমরা প্রথমে হিন্দু বা মুসলমান. তারপরে বাঙালী। ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতার ছিদ্রপথে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা আগের মতই প্রবহমান–তাই মনে হয় এই উভয় রাষ্ট্রেই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে রাবীন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা এখনো বাস্তবতায় সজীব, যদিও পরিবেশের সার্বিক ও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সমাজতান্ত্রিক পথে নিরসনের কথা ভাবেননি, চেয়েছেন মানবিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রেমপ্রীতি কল্যাণ ও শান্তির ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ধর্মীয় বোধের নবতর উপস্থাপনায় মানব সম্পর্ক সুন্দর ও মহৎ করে তুলতে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই একই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, যাতে প্রয়োজনমাফিক মানুষ প্রচলিত ধর্মবোধ ত্যাগ করেও সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হতে পারে, শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু এই উপমহাদেশে ধর্মীয় প্রভাবের প্রবল উপস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চিন্তাবিদগণও এই অন্ধ উপকরণটিকে বর্জন বা পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারছেন না। কারণ, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী বিপরিত পথেই চলতে অভ্যস্ত। শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, আপাতত সমাজ জীবনেও তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই এগুতে হচ্ছে, যদিও এই পরাক্রান্ত উপকরণটি উপমহাদেশে বার বার বিভিন্ন সূত্রপথে প্রগতির যাত্রা বিঘ্নিত করেছে, নানা উপলক্ষে, নানান পরিবেশে। শ্রেণীসংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ধর্মকে যে বাতিল করা যাচ্ছেনা,

সমাজমানসে তার বিপুল প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে,—এই বাস্তব বোধ মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য ধর্মকে বাতিল করতে না পারার অর্থ তাকে সর্বাংশে গ্রহণ করা নয়। একে সরাতে হবে পর্যায়ক্রমে সংগ্রামী বলিষ্ঠতার ক্রমবর্ধনের সাথে সাথে, ধাপে ধাপে—অর্থাৎ রাষ্ট্র থেকে সমাজে, সমাজ থেকে ব্যক্তিজীবনের নির্বাসনে, এবং এই শেষ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে নিয়েই ঘর করতে হবে, সতর্ক প্রহরার উপস্থিতিতে, যাতে ঘর ভাঙ্গার কাজটি সে সম্পন্ন করতে না পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কৈলাশ ও লক্ষ্মীর সমস্যা ধর্মীয় জটিলতার দ্বন্দ্বে ব্যথা-বেদনায় ব্যঞ্জনাময়। প্রচণ্ড ইচ্ছা সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলনের বলিষ্ঠ খুঁটি কৈলাস উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও যেমন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছে না সামাজিক বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে, তেমনি পারছে না মিলন-সমাপনের সহজপথ ধর্মান্তর গ্রহণে এগিয়ে যেতে :

> “ধর্ম শিকড় গেড়ে জাকিয়ে রয়েছে দেশে, তুমি আমি বললেই তো বাতিল হবেনা। সবার সাথে থাকতে গেলে গোয়ার্তুমিও চলেনা একেবারে কিছুই না মানার। পোড়া সংস্কারের ছাই গাদাতেও তাই চারা গজায়, বিশ্বাসের পোড়া ডালে গজায় নতুন পাতা।...কী অভিশাপই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য যুগযুগান্ত ধরে। জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়েও প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায়না একেবারে।”(২৮)

সত্যই জনতার সাথে অগ্রযাত্রার পথেও অনেক সময় তাদের থেকে খুব বেশী দূর এগিয়ে যাওয়া যায় না অতি-প্রগতির পথ ধরে ; এক পা এগোলে, অনেক সময় কোন কোন বিষয়ে দু'পা পিছোতে হয়। সংস্কার ও ধর্মীয় চেতনার দীর্ঘকালীন যে শিকড়গুলো সেই শিশু বয়স থেকে বিশেষ পরিবেশে পুষ্টিকর উপাদানের অনুকূল প্রভাবে চেতনার গভীরে মূল চালিয়ে দিয়ে এতদূর চলে যায় যে তাদের উপড়ে ফেলতে প্রবল শক্তির প্রয়োজন হয়, কখনো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ ধর্মীয় সংস্কারের এই গভীর-মূলীয় প্রভাবের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় আদর্শ বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন। এবং একমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমেই এই ভীষণ ভয়ংকর ধারালো উপকরণটিকে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ স্থূল ও বিবর্ণ করে ফেলা সম্ভব—অর্থাৎ পদ্ধতিটি পুরোপুরি বৈপ্লবিক বা সংগ্রামী গুণগ্রামে নিষিক্ত নয়, এটি আধা-

সংস্কারবাদিতার পথ। বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সত্ত্বেও এই উপকরণ ও তজ্জাত সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য, তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ আজো অনুধাবনযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক এবং কখনো কখনো পথ-নির্দেশের সহায়ক। এমন কি একদিক থেকে বিচার করতে গেলে স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে দেশবিভাগের সম্ভাব্য পরিণামটি যেন আকারে ইঙ্গিতে ও পরোক্ষে রৈবিক বক্তব্যে ফুটে উঠেছে এবং পরোক্ষ এই সম্ভাবনা সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সহিষ্ণুতা এবং ঐ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রদায়গত পরিস্থিতির বাস্তব ব্যবচ্ছেদের মধ্যে এই সম্ভাবনার ছায়াই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বস্তুতঃ ধর্ম সম্পর্কে বিশেষতঃ ধর্মীয় সংস্কার ও অন্ধতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত ও ভূমিকা যেমন বাস্তবধর্মী তেমনি বিস্ময়কর। এই বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ মানসিকতা রাবীন্দ্রিক গল্প কবিতা উপন্যাস পাঠকের খুব একটা জানা নেই। একে জানা প্রয়োজন ; তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তি ও সংশয় দূর হবার সম্ভাবনা বরং সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং সেই সঙ্গে এ সত্যও ধরা পড়বে যে ধর্ম নামক একটি পরাক্রান্ত প্রভাবকে মানব-স্বভাবের মহিমার কাছে পরাজিত করবার সাধনায় মানবতাবাদী কবিও নির্ভীক সততায় এগিয়ে যেতে পারে, যাতে করে চেনা যায় সংস্কার ও অন্ধতার গভীর ও বিস্তৃত অন্ধকার, যা আমাদের জড়িয়ে রেখেছে প্রাত্যহিক অভ্যাসে, মনের চেতন-অবচেতনের চোরাগলিতে, কখনো বা হঠাৎ জেগে-ওঠা প্রতিক্রিয়ার কালো রেখায়। রবীন্দ্রনাথ, বলাবাহুল্য, এই উপকরণটির সর্বমুখী রূপ গভীর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তাঁর চেতনায় ধরতে পেরেছিলেন, চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রে, সমাজে ও ব্যক্তিক মননে এর প্রভাব। তাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিলো সর্বজনীনতার গুণে নিষিক্ত করে এর অবয়ব থেকে বিভেদী কাঁটাগুলোর অপসারণ, যাতে মানুষে-মানুষে মিলনের পথ মসৃণ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। স্বদেশে কবি এই মানবমুখীন রূপান্তর চেয়েছিলেন ধর্ম ও সম্প্রদায়-চেতনার, যা তাঁর মতে ছিলো এদেশে মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম সনদ।

তথ্য-নির্দেশ

১. সৌদামিনী দেবী, 'পিতৃস্মৃতি', প্রবাসী (ফাল্গুন, ১৩১৮) : ৪৭২

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধর্মের নবযুগ', রচনাবলী-১৮শ (১৩৫১) : ৩৫১-৩৫২

৩. ঐ 'জীবন স্মৃতি', রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৩৭৭

৪. ঐ 'আত্মপরিচয়-৩', ঐ : ২১৩

৪ক. ঐ ঐ ঐ : ২২৩

৪খ. ঐ ঐ ঐ : ২৩৫

৪গ. ঐ ঐ ঐ : ২২৫

৫. ঐ আত্মপরিচয়-৫, ঐ : ২৪৩

৬. ঐ 'ধর্মপ্রচার', রচনাবলী-১৩শ (১৩৪৯) : ৩৭৮

৭. ঐ 'ভক্ত', শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা, রচনাবলী-১৪শ (১৩৪৯) : ৪৯২

৮. ঐ 'অগ্রসর হওয়ার আহ্বান', শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা, রচনাবলী-১৬শ (১৩৫০) : ৪৮৭

৯. ঐ 'সৃষ্টির ক্রিয়া', শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা, ঐ : ৪৯৮

১০. ঐ 'রসের ধর্ম', শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালা, রচনাবলী-১৫শ (১৩৫০) ৪৪৭-৪৪৮

১১. ঐ 'ধর্মের অধিকার', রচনাবলী-১৮শ (১৩৫১) : ৪০৩

১২. ঐ 'ব্যাধি ও প্রতিকার', রচনাবলী-১০ম (১৩৪৮) : ৬২৮-৬৩০

১৩. ঐ 'হিন্দু-মুসলমান', রচনাবলী-২৪শ (১৩৫৪) : ৪৪৬, ৪৪৫

১৪. ঐ 'সমস্যা', ঐ : ৩৫৩-৩৫৪

১৫. ঐ 'হিন্দু-মুসলমান'-(কালিদাসকে নাগ-কে লিখিত), ঐ : ৩৭৫-৩৭৬

১৬. ঐ 'স্বরাজসাধন', ঐ : ৪১৭

১৭. ঐ 'রাশিয়ার চিঠি-৭', রচনাবলী-২০ (১৩৫২) : ৩০৮

১৮. ঐ 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ', রচনাবলী-২৪ (১৩৫৪) : ৪৩১

১৯. ঐ 'সদুপায়', রচনাবলী-১০ম (১৩৪৮) : ৫২৬

২০. ঐ 'সভাপতির অভিভাষণ', ঐ : ৫২৬

২১. ঐ 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়', রচনাবলী-১৮শ (১৩৫১) : ৪৭৪

২১ক. ঐ ঐ ঐ : ৪৭৫-৪৭৬

২২. ঐ 'চরকা', রচনাবলী-২৪শ (১৩৫৪) : ৪০৮

২৩. ঐ 'বিশ্বভারতী বক্তৃতামালা-৫', রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৩৫৮

২৪. ঐ 'ছোটো ও বড়ো', রচনাবলী-২৪শ (১৩৫৪) : ২৭৪

২৫. ঐ 'জাপানযাত্রী', রচনাবলী-১৯শ (১৩৫২) : ৩০২

২৬. ঐ 'সাহিত্য সম্মিলন', রচনাবলী-২৩শ (১৩৫৪) : ৪৮৫-৪৮৬

২৭. ঐ 'পারস্যে-৪', রচনাবলী-২২শ (১৩৫৩) : ৪৬১

২৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইতিকথার পরের কথা', মানিক গ্রন্থাবলী-৮ম (১৩৮০) : ৪৮৮

মাটির ভুবন ঃ গভীর মননে

দেশের মুক্তি ও স্বরাজের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ কখনোই ভাবাবেগ বা অন্ধতা কিংবা যান্ত্রিকতার প্রভাবে বিদগ্ধ হননি। বাস্তবোচিত বিচক্ষণতায় এ সম্পর্কে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব মতামত, যা একান্তভাবে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দেশের প্রকৃত মুক্তির অন্যতম সর্ত রূপে তাঁর চোখে ধরা পড়েছিলো গ্রাম ও তার অশিক্ষিত, বিত্তহীন সন্তানদের মানুষ করে তোলা, তাদের চিত্তবৃত্তিতে শিক্ষার শান্ দেওয়া, যাতে শ্রম, আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদার ঝলসানি ফুটে উঠে সেখানে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো সংস্কারবাদিতার ঝোঁক মন হতে পারে, কিন্তু তাঁর সার্বিক রাজনৈতিক চিন্তার সাথে মিলিয়ে দেখলে এতে কিছুটা অন্যতর গুণ বর্তায়।

বিদেশী শাসন যে একালে মধ্যযুগের একক সম্রাটের স্থান গোটা জাতি হিসাবে দখল করে বসেছে, এবং তাতে করে দেশের বিপুল পরিমাণ রক্তশোষণের ফলশ্রুতিতে এই হতভাগ্য দেশে বরাবর শূন্যের দিকটাই ভারী করে তুলেছে, এ সত্য তাঁর প্রবন্ধাবলীতে পূর্বাপর স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম, গ্রামীণ অবস্থা, কৃষক ও তার জমি ইত্যাদি সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো সুস্পষ্ট। এবং সামগ্রিকভাবে স্বাদেশিকতার পটভূমিতে জমি, চাষাবাদ ও কৃষক—এক কথায় গ্রামের সুষ্ঠু উন্নতির উপর জোর দিয়েছেন সর্বাধিক। কবির ভাষায় ঃ

> "পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই ; দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।"(১)

বিদেশী-শাসনে সীমিত শিল্পায়ন ও আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ দেশের বৃহত্তর জনসমাজ-অধ্যুষিত গ্রামীণ অর্থনীতিকে দিয়েছে পঙ্গু করে, যদিও একদা কৃষি ও কুটির শিল্পনির্ভর এদেশের প্রাণ-কেন্দ্র তথা উন্নয়ন কেন্দ্র ছিলো গ্রাম। নগর এখন শক্তিকেন্দ্র, অন্যদিকে গ্রাম দেশের প্রাণকেন্দ্র ; কিন্তু শক্তির প্রকাশ অর্থকে কেন্দ্র করে। এই কালক্রমিক বিবর্তন রবীন্দ্র-মানসে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ছিলো, এবং উপনিবেশিক স্বার্থ যে বাংলার কুটির-শিল্প তথা তাঁতশিল্পকেও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, সে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি ঃ

> "একদিন বাঙালী শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না। সে ছিল যন্ত্রজীবী। মাড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।"(২)

কিন্তু উপনিবেশী শোষণ শুধু বাংলার মসলিন তাঁতীর বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েই তৃপ্ত হয়নি, উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-নীতি অনুসরণ করে এদেশের স্থানিক শিল্পোদ্যম বিনষ্ট করে দিয়ে উপনিবেশিক শিল্পের বাজার সৃষ্টি এবং প্রয়োজন-মাফিক সীমিত শিল্পায়ন সম্পন্ন করেছিলো উঠতি-ধনিকদের সাহায্যে ; এবং সেটাও সাম্রাজ্যের খুঁটি শক্ত করে তোলার অনেক অনেক পরে। মুৎসুদ্দি-ধনিকতন্ত্রের আংশিক বিকাশের সাথে সাথে একদিকে যেমন গড়ে উঠতে লাগলো উঠতি সভ্যতা ও ধনের ঝলসানি নিয়ে শক্তিকেন্দ্র নগর, তেমনি তার টানে গ্রামের সব শ্রী ও সম্পদ এসে জড়ো হতে লাগলো নগরকেন্দ্রে। আর তখনো কৃষিনির্ভর ও কৃষি-অর্থনীতি-ভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ও সভ্যতা মুছে গেলো না ; কিন্তু তাতে রক্তহীনতার বিবর্ণ পাণ্ডুরতা ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকলো। বিত্তহীনতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মাচারের অন্ধ প্রভাবে গ্রাম ও তার সমাজ ক্রমেই বিশীর্ণ, অন্ধকার হয়ে উঠতে লাগলো। শহরবাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারী দেখাশোনার উপলক্ষে এবং শিল্পী-হৃদয়ের সংবেদনশীলতার টানে গ্রামের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজের এই ভয়াবহ অবস্থার সাথে সম্যক পরিচিত হতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে একথাও বুঝতে তাঁর কষ্ট হয়নি যে বৃহত্তর এই জনসমাজের দুর্ভোগ জাতীয়

অবনতির মূল উৎস :

> "কর্ম উপলক্ষে বাংলার পল্লী-গ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়ত্বাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কি-রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি।"(৩)

বাংলার গ্রাম ও কৃষকদের দুরবস্থা তাঁর মনে এমন দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করেছিলো যে পৃথিবী পর্যটনের সময়ও এই চিন্তা উপলক্ষ্য পেলেই বেরিয়ে আসতো। রাশিয়ায় শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থার অভাবিত পরিবর্তন দেখে তাঁর মনে প্রথমই স্বদেশের কৃষক-শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা জেগে উঠলো :

> "নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ-সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে ; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা-পুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে।"(৪)

রাশিয়া-ভ্রমণের বছর ছয়েক পরেও শান্তিনিকেতনে উপস্থিত সাহিত্যিকদের সভায় এক ভাষণে তাদের গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি অনুধাবনের আহ্বান জানান :

> "কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায় তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্নবস্ত্রে অর্ধাশনে দিন কাটায়।
> "আমি পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য ; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয় কী দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন।
> "এই যে কর্মের ধারা এখানে প্রবর্তন করেছি,...এ কাজ একার নয়। এই কর্ম বহু লোককে নিয়ে। বহু লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়।... আপনারা দেখে যান বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়।"(৫)

বলা বাহুল্য এখানে ফুটে উঠেছে এক মানবতাবাদী শিল্পীর আত্যন্তিক মানসিক সততা, যার সাহায্যে রূপসী বাংলার গ্রামীণ সৌন্দর্যের আড়ালে

প্রবহমান অভাব-অনাহারের কংকালী ছায়া অনুধাবন করা চলে। বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখেছি যে, এখানেই এই মানবিক কবির মহত্ত্ব। নিজে জমিদার হওয়া সত্ত্বেও জমি-জমিদার চাষী-মহাজন সম্পর্কের অন্তর্নিহিত জটিলতা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। রাশিয়ার চিঠিতে এবং আরো বিভিন্ন প্রবন্ধে ঘুরেফিরে একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেছেন যে : "জমির স্বত্ব ন্যায়তঃ জমিদারের নয়, চাষীর।"(৪)

'রায়তের কথা'য় বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে :

> "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিষটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে উপার্জন না করে ঐশ্বর্য ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"(৬)

সামন্ততন্ত্রের শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটিত করেও বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ জোতদার-মহাজনের জটিলতায় বিশ্লেষণ করতে চেয়ে অধিকতর জটিলতায় উপনীত হয়েছেন। প্রথমতঃ তাঁর মনে হয়েছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঋণজর্জর চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেও তা স্থায়ী হবেনা, কারণ অভাবের তাড়নায় সে অচিরেই জমি বিক্রি করতে বাধ্য হবে মহাজনের কাছে, অথবা নীলাম হয়ে মহাজনের হাতে পৌঁছাবে তার অমন সাধের জমি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই সমস্যা-দর্শন কাল্পনিক কিছু নয়, সেকালে মহাজনদের অবাধ দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই অবহিত আছেন, আর রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয়টি বিচার করেছেন, সমাজতত্ত্বের নিরিখে নয়। তাঁর সরস ভাষায় :

> "ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের (জমিদার ও মহাজন) মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব সমাসে তা আর টেঁকেনা। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি। মহাজনকে বঞ্চিত করিনি, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে বাধ্য করেছি।"(৬)

উল্লেখযোগ্য যে এ বক্তব্যের সাথে একমত হয়েও আমরা বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে আপন-মানসিকতাকে সাধারণ সূত্র রূপে গ্রহণ করেছেন, যা অন্যত্র বাস্তবে ঠিক বিপরিত। প্রসঙ্গতঃ তিনি নীলকরদের অত্যাচার এবং প্রজার জমি গ্রাস করা থেকে জমিদারদের কারো কারো রায়তের পক্ষ সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছেন, যে বিষয়ের সত্যতা এবং বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করিনা। তা ছাড়াও দুর্বল রায়তের ছোট ছোট জমি ছলে, বলে, অর্থের জোরে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়তের জোতদার হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াও রবীন্দ্রনাথ ঠিকই দেখেছেন, এবং এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি, যার শেষ ধাপে জোতদারদের কেউ কেউ জমিদারে পরিণত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ জমির মালিকানা প্রসঙ্গে অংশতঃ সংস্কারবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, যদিও তার সাথে মিশে আছে শোষিত-নিরন্ন কৃষকের প্রতি আন্তরিক সমবেদনার শুভবুদ্ধি।

এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা যায় রবীন্দ্র-মানসে জমিদারের ভূমিকা সম্পর্কে বড় একটা মোহ ছিলোনা। অনেক ক্ষেত্রেই কবি স্পষ্টভাষায় জমিদারের আগ্রাসী লোলুপতার দিকটা তুলে ধরেছেন। একসময়ে তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের কালে চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'বাংলাদেশে জমিদারের চেয়ে গবর্মেন্টের বড় কর্মচারী আর কেউ নেই।' তাছাড়াও তাঁর ভাষায় :

> "আমি জানি জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাঁধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করার হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া—যদি তাও না মান, এটা মানতে হবে, সেটা আর একটা উপরি-মুষ্টি।"(৬)

জমিদারি ভেঙ্গে ভেঙ্গে জোতদার সৃষ্টি হবার এবং মহাজন-মুৎসুদ্দির ভয়াবহ জালে আবদ্ধ হবার অনিবার্য পরিণতি যে রায়তের পক্ষে কী বিষম অর্থনৈতিক সংকট, সে কথা ভেবে সমাধানের পথ খুঁজেছেন কবি। সমাধানে পৌঁছাবার জন্য তাঁর আন্তরিকতার ও পথ অন্বেষার বিরাম ছিলনা। তাই অক্লেশে বলতে পেরেছেন :

> "কেমন করে হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কিনা জানিনে। তবু আমি পারি বা না

> পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে ; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ।"(৬)

রায়তের এই অর্থনৈতিক অসহায়তার কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা বিচ্ছিন্ন পথে কোন না কোন একটা সমাধানে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছে। মহাজনদের সম্বন্ধে তাঁর অতি সতর্কতা বাস্তবোচিত, কেননা শুধু গ্রাম-বাংলায় নয়, সাঁওতাল পরগণায় মহাজনদের অত্যাচার যে শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ হয়ে ওঠেছিলো, সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল পরিচ্ছন্ন। তাই তাঁর মনে হয়েছে আত্মরক্ষার শক্তি ভেতর থেকেই সংগ্রহ করতে হবে (সেই বহুকথিত 'আত্মশক্তি')। বাইরে থেকে চাষীকে বাঁচাবার কোনো পন্থা নেই, তাঁর ভাষায় ঃ

> "তাই বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কংগ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা ক্রীত অধিকারে নয়।"(৬)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী সংস্থা এ সমস্যার সমাধান করতে আসবেনা। "পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণ সঞ্চারের" মাধ্যমে হয়তো সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেমন করে সম্ভব হবে "প্রাণ সঞ্চার" ? কংগ্রেসকে তিনি তাই বারবার বলেছেন ঃ "যেখানে এত দুঃখ এত দৈন্য এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে"(৫) কংগ্রেস ? তাই মরীয়া হয়ে কবি কংগ্রেসের পাবনা কনফারেন্সে অন্যান্য বারের মতোই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব স্বরাজ-লাভের মোহে আশু ফল সম্বন্ধেই ব্যস্ত ছিলো, তার প্রাসঙ্গিক পরিণতি ও সম্ভাবনার দিকগুলো বিচার করতে রাজী ছিলো না। আজ, সেই পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সত্তর বছর পরেও, সেই প্রশ্নই থেকে যায় যে আপোষে স্বাধীনতা লাভের ত্রিশ বছর পরে কি উপমহাদেশে কৃষকের শ্রেণীগত দুরবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে ? বিষয়টি নিঃসন্দেহে অনুধাবনের ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিতে গভীর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, এবং একাধিক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ঃ

> "তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যারা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক বলে অনুভব

> করতেন। আমার মনে আছে, পাবনা কন্ফারেন্সের সময় খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, দেশের মানুষকে তারা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।"(৪)

মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্বের অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই বোধহয় কবি বুঝতে পারেননি যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ তার শ্রেণীস্বার্থের খাতিরেই কৃষককুলের শ্রেণী-স্বার্থের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না ; আর এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, বলা বাহুল্য, মানুষ হিসাবে শোষিতের প্রতি শুভকামনা সম্পন্ন কবির মানবিক-চেতনা প্রসূত।

পথের সন্ধানে ক্লিষ্ট কবি তাই বিভিন্ন বৈপরিত্যময় পথে এগুতে চেয়েছেন। জমিদারের প্রতিও পল্লীসচেতন হবার জন্য, পল্লীতে প্রাণ-সঞ্চারে উদ্যোগী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন :

> "এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা।"(৭)

কিন্তু কৃষককে শোষণের উৎস বহুমুখী—জমিদার, মহাজন, সর্বোপরি বিদেশী শাসন। জমিদারের হাত থেকে মহাজনের চক্রবৃদ্ধির শতপাকে বাধা পড়া এক অর্থে কড়াই থেকে উনানে পড়া :

> "মহাজনেরা চাষীদের অধিক সুদে কর্জ দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় জানি না। অতএব গবর্মেন্টকেই অথবা বিদেশী মহাজন দিগকে যদি বলি যে, তোমরা অল্প সুদে গ্রামে গ্রামে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করো, তবে নিজে খদ্দের ডাকিয়া চাষিদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না ?"(৮)

তাই ১৯০৫ সালে তাঁর প্রস্তাবিত কর্তৃসভা (একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের নেতৃত্বে) গঠনের মাধ্যমে সমস্যার আংশিক সমাধান পেতে চেয়েছেন কবি। তাঁর মতে দেশের বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড কর্তৃসভা স্থাপনের দ্বারা পল্লীর শাসনভার হাতে নেওয়া হলো তেমনি একটি পদক্ষেপ :

> "সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পাঞ্চায়েৎ-কে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে রক্ষা করিব।

> তাহার সন্তানদিগকে শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য বিধান করিব, এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে জমিদার ও প্রজাদিগকে বাঁচাইব।"(৮)

দুই বছর পর তিনি আবার পাবনায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সম্মিলিত শ্রোতার সামনে বক্তব্য রাখলেন এই মর্মে যে :

> "রায়ত দিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভন মাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে।
>
> "আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য সমস্ত চেষ্টা একজায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারে বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।
>
> "শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে পারিবে।"(৭)

কিন্তু কিছুতেই তা হবার নয়। এরপর দুই দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে ও ব্যক্তিগত উপদেশে পল্লীর দেহে প্রাণসঞ্চারের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এমন কি ১৯২৬ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র জবাবেও এই একই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ইতিমধ্যে গঙ্গা-মেঘনায় অনেক পানি বয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের যৌথ সম্ভাবনা রক্ত ও তিক্ততার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। বয়সের ভারে জীর্ণ, স্বদেশের রাজনৈতিক নৈরাজ্যে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথের মনের অশান্তিতে যেন সাময়িক প্রলেপ পড়লো রাশিয়ায় এসে, এখানকার চাষীদের দেখে। নিশ্চিত বিশ্বাসে আবার জোয়ারের স্পর্শ লাগলো : "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে।"

কিন্তু কেমন করে? এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সমাধানের উপায়টিকে বড় বেশী সরল করে ফেলেছিলেন। রাশিয়ায় শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দেখে তার কবি-হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠার ফলে একটি সহজ বিষয় তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিলো যে এই অবস্থান্তর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোতেই সম্ভব হয়েছে, তা না হলে শোষণের মূল পদ্ধতিটি বিলোপ করা সম্ভব হতোনা। প্রসঙ্গতঃ একটি বহু-চর্চিত সিদ্ধান্তেই আমাদের পুনরায় স্থির হতে হয় যে, শ্রেণী-চেতনার তত্ত্বে বিশ্বাসী না হতে পারলে বা

বিশ্লেষণের কাজে সেই তত্ত্বকে অন্ততঃপক্ষে প্রয়োগ করতে না পারলে শিল্পীর নির্মোহ সততাও তাকে রাজনৈতিক সমাধানের নির্ভুল বিন্দুতে (বিশেষ করে শ্রেণীগত রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে) পৌঁছে দেয়না। বড়ো জোর সমস্যার বাস্তব ও প্রকৃত চেহারাটা ধরা যায়। রবীন্দ্রনাথের কৃষক-জমি-গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও এই সত্যটিই প্রকট হয়ে উঠেছিলো। তাই চাষীকে আত্মশক্তিতে শক্তিশালী করার প্রথম ধাপ কবির চোখে 'ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার'—যা কৃষকের প্রাকৃত চেতনায় আত্মসচেতনার দীপ্তি ঝরাবে। দ্বিতীয়তঃ ছোট ছোট জমিগুলোকে একত্রিত করে রাশিয়ার যৌথ খামার পদ্ধতির ক্ষুদ্রায়তন ব্যবস্থায় চাষের কাজ সম্পন্ন করা ঃ

> "সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারেনা। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙ্গল নিয়ে আল্‌বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।"(৪)

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমাদের দেশে এ কাজটি "দুরূহ"। কিন্তু সংঘবদ্ধ জনশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে আধুনিক যন্ত্রশক্তির সাহায্যে যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থায় সাফল্য আনার প্রত্যাশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বপ্ন ছিলো ঃ স্বীয় চেষ্টায় দু-একটি গ্রামে আদর্শ বা প্রতীক হিসাবেও যদি এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। তাহলেই জয় করা হবে একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম।(১)

> "দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে।
>
> "যন্ত্রের বিপদ আছে মানি। বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে। যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণ টাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।"(২)

বুঝতে ভুল হয়না যে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন-পদ্ধতির বিভিন্নতা ও তার ফলশ্রুতি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর অভিপ্রায় ছিলো যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের শূন্য উঠান ভরে তোলা। অথচ একই

সঙ্গে কলেখাটা সাঁওতাল-ছেলের রক্তহীন শীর্ণতা তাঁর নজর এড়ায়নি। তাই বিচক্ষণ সমাজকর্মীর মতো রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন :

> “বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।
>
> “মানুষের শক্তির এই নূতন বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আবাহন করে আনতে পারেনি বলেই চারিদিকে পরাভবের দৃশ্য। এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।
>
> “এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী।”(১০)

প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিকেতনের প্রচেষ্টা তো একটি আদর্শ অণু-কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়াস—কিন্তু কবির সে স্বপ্ন কতটুকু সফল হয়েছে সেটাও বিচার্য।

জমি, জমির অধিকার, কৃষির উন্নতি, পল্লীর উন্নতি প্রভৃতি প্রশ্নের সর্বাঙ্গীন বিচারে দেখা যায় রবীন্দ্র-মানস জমিদার-জোতদার-মহাজনের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে সচেতন। রায়তের জমিতে খাজনা বৃদ্ধি যে জমিদারের পক্ষে অন্যায় সেকথাও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্র-নাটকের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ধনঞ্জয় বৈরাগী রাজাকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে জানাচ্ছে যে ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে খাজনা তার প্রাপ্য নয়। আবার এই রবীন্দ্রনাথই রায়তের কথায় জানাচ্ছেন যে “যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে বাঁচাবার এই-যে শক্তি তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে।” অর্থাৎ চাই সামগ্রিক বিচারে কার্যকরী একটি পথ নির্দেশ। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে রবীন্দ্রমানসের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর পক্ষে যেমন কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করা সম্ভব নয়, তেমনি শক্ত তাঁর পক্ষে জবরদস্তির রাজনীতি হজম করা, হোকনা তা নির্যাতীতের পক্ষে। এই বিশেষ মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত তাঁর ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্কে মতামত যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে জবরদস্তি বা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তাঁর বহু-নিন্দিত মন্তব্যাদি। যদিও প্রায় একই সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্যা-সমাধান প্রচেষ্টা সম্পর্কে রয়েছে অকুণ্ঠ সাধুবাদ।

এই বিশেষ ধ্যান-ধারণা থেকেই রাশিয়া ভ্রমণের চার বছর পূর্বেকার লেখা ‘রায়তের কথায়’ তিনি রায়তের সমস্ত অধিকারের নৈতিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও রায়তের স্বপক্ষে বলপ্রয়োগকে মনে করেছেন জবরদস্তি ; এবং এই প্রসঙ্গেই ব্যক্ত তাঁর কয়েকটি বহু-পরিচিত উক্তি (চল্লিশ দশকে রবীন্দ্র গুপ্ত

ছদ্মনামে 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত ভবানী সেনের সমালোচনা স্মর্তব্য) আমাদের চকিত করে তোলে :

> "রাশিয়ার জারতন্ত্র ও বলশেভিকতন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। আজ যখন শুনে এলুম ইশারা চলছে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালীর অসাধারণ নকল নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো।"(৬)

অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক সমাধান জবরদস্তির পথে নয়। নিচের স্তরটাকে তুলে সমান স্তরে শক্তিমান করতে হবে, তা না হলে পাপ ও চাপ আবার বিপরিত দিক থেকে দেখা দেবে।

> "অতএব দেশের চিত্তবৃত্তিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে, সে যদি নিছক কাঁটা গাছই হয়, তাহলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরা গাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটা গাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটি বদল হল না তো।"(৬)

কবির মতে 'পাপকে তার ভেতর থেকে মারতে হবে। আর তাতে অনেক সময় লাগে।' আসলে, জমিদার হিসাবে আপন উদার মানসিকতা, মানব-সম্বন্ধকে মহত্তর মর্যাদা দেবার প্রয়াস এবং সর্বোপরি প্রজাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতির সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলেছে জমি-কৃষক-জমিদার সম্পর্কিত রাবীন্দ্রিক বিচার-বিশ্লেষণে। তাই সামগ্রিক বিচারে জমিদার গোষ্ঠীর ভয়াবহ অত্যাচারের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতায় ভ্রান্তির সুযোগ রয়ে গেলো, প্রধানতঃ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতন্ত্রের এমন একটি সামগ্রিক বিষয় বিচার করার জন্য। এখানেই মানবতাবাদী শিল্পীর একটি প্রবল সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধিতা।

স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতা এই জন্যে যে, চার বছর পরে রাশিয়া ভ্রমণের সময় এই রবীন্দ্রনাথই সমাজতন্ত্রী রাশিয়ায় রাষ্ট্রচালিত খামার ও সমবায় প্রথায় চাষ এবং সমগ্র জন সাধারণ্যে ব্যাপক শিক্ষার মহতী প্রয়াস দেখে অভিভূত হয়েছেন :

> "রাশিয়ার জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ ও সম্মান লাভ করল।
> "রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো।"(১১)

অন্যদিকে একই সময়ে রাশিয়া থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিতে নিজেদের জমিদারি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চিত্তাকর্ষক এবং গুণগত অর্থে ভিন্নতর :

> "বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোষাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেলনা।...তারপরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল, তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে দুঃখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনা শোধ হয়, তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।
>
> "আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে ; আমি পারিনি বলে দুঃখ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। মৃত্যুর আগে সে'দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না।
>
> "ধনীর পোষাক আমাদের ছাড়তে হবে, নইলে লজ্জা ঘুচবে না। এখন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে পারব।"(১২)

একই সময়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতেও অনুরূপ বেদনাবোধের পরিচয় মেলে। ইতিহাসের যুগ সন্ধিক্ষণে নতুন ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নেবার উপদেশ, ধনের বিপুল সঞ্চয় ও অমিতব্যয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অন্যায়ের প্রতি ধিক্কার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> "এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে। ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী নিরর্থক। জীবনযাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।
>
> "যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধহয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।"(১৩)

ইতিহাস-সচেতন বিচক্ষণ মানুষের মতন কবি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন ইতিহাস-লব্ধ জ্ঞানের আলোকে ভালোমন্দ নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করতে :

> "ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বানিয়ে নেওয়া

> কিছুই শক্ত নয়, যদি অন্তরের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আলগা করে দিই।"(১৩)

কবির এই বেদনাহত চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গেলে মনে পড়ে যায় শ্রেণী-সচেতন মানিক-সাহিত্যের কথা যেখানে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফুটে উঠেছে আধা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট জীবনের জটিলতা, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার ব্যর্থ প্রয়াস ইত্যাদি। এর অর্থ রবীন্দ্রনাথকে মানিক বাবুর সমান্তরাল করা নয়, শুধু একটি মাত্র তাৎপর্য তুলে ধরা যে সচেতন শিল্পীর আন্তরিকতায় সমস্যা ও সংকট কত সহজে ধরা দেয় অগ্রবর্তী সময় ও পরিবেশে উপস্থিত হয়েও। বস্তুতঃ 'বাঁধন আলগা করার' প্রচেষ্টা, 'বাঁধন ছেড়ার' তাগিদ এবং 'জীর্ণ পুরাতন ভেঙ্গে-চুরে' এগিয়ে যাবার প্রয়াস রাবীন্দ্রিক সাহিত্যের আত্যন্তিক সাধনা। তাই আপন বার্ধক্যের দায় ও সীমাবদ্ধতার দুঃখে রবীন্দ্র-মানসের পরিতাপ যেমন আন্তরিক তেমনি গভীর :

> "আমার সবচেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়—যারা পথ চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে।"(১৪)

তথাপি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও চেষ্টার বিরাম ছিলো না তার ; পল্লীগ্রাম ও কৃষকদের জন্য পথনির্দেশের উপযুক্ত কিছু সমাপনের তাগিদ অন্তরে ছিল বরাবর সজাগ। তাই নির্বিচারে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন :

> "আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই।"(১৫)

এ কি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রতি অভিযোগ, না অভিমান ? বিশেষ করে রাশিয়া ভ্রমণের ছয় বৎসর পর প্রকাশ্যে এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরায় ? তবে একথা সত্য যে সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য তথা শোষণের অবসান, শ্রমিক-কৃষক সমস্যা, সমবায় রীতিতে চাষ প্রভৃতি বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া রবীন্দ্রমানসে বেশ প্রভাব ফেলে ছিলো, যার

ফলে একই বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা প্রভেদ লক্ষিত হয়। আর সেজন্যই কি সমাজতন্ত্রী দেশের ভয়ে সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে ১৯৩৪ সালে ‘মডার্ণ রিভিউ’ পত্রিকায় ‘রাশিয়ার চিঠি’র অনুবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর এই নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত আলোচিত হয়?(১৫) আমাদেরও বুঝতে কষ্ট হয়না কেন রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো তারবার্তার অংশ বিশেষ কেটে ফেলা হয়। আর কেনই বা ইংরেজ সরকার মনে করে যে সেই কর্তিত অংশবিশেষ পড়লে শুধু ব্যক্তি বিশেষেরই নয়, ভারতবর্ষের এবং গ্রেটব্রিটেন সহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশেরও অমঙ্গল হবে। এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার অধ্যাপক পেট্রোভকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের তারবার্তার অংশবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

> “Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.”(১৬)

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সম্পদের অধিকার ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে উত্তরণে কবির অভিনন্দন। প্রসঙ্গতঃ সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মাঝামাঝি পথের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য :

> “এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।”(১৭)

এমনি করেই অনেক ক্ষেত্রে একটা মধ্যপন্থা—তাকে আমরা সংস্কারবাদী বা আপোষবাদী বা শান্তিবাদী নীতি যাই বলি না কেন, বরাবর রবীন্দ্রমানসে প্রশ্রয় পেয়ে লালিত হয়েছে। হয়তো সে কারণেই জমির স্বত্বে ন্যায়তঃ কৃষকের দাবী স্বীকার করেও জমিদারি ছেড়ে দিতে পারেন নি ব্যক্তিগত সমস্যার তাড়নায়। অন্যদিকে পূর্বাপর চেষ্টা করেছেন যাতে কৃষককুল জমিদার-মহাজন দ্বারা নিপীড়িত না হয়, যাতে সমবায় চাষের মাধ্যমে বহু-উল্লিখিত সমস্যাটির সমাধানে পৌঁছা যায়, দেশের সমগ্র স্তরের জনসাধারণের মধ্যে যাতে স্বদেশচেতনার মাধ্যমে একটি সামঞ্জস্যবোধ ও ঐক্য গড়ে ওঠে এবং সর্বোপরি শিক্ষার মাধ্যমে যেন অবহেলিত পল্লীবাসীর জীবনের অভিশাপ গুলোর নিরসন হয়। কিন্তু আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথ

এই নির্মম সত্যটুকু বুঝতে চাননি যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাধান পরস্পর-নির্ভরশীল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তার অনেক বাস্তবধর্মী চিন্তার ও প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ এই বিশেষ সূত্রে নিবদ্ধ। পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ছিলো তাঁর স্বাদেশিক-চেতনার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। তথাপি এই আন্তরিক প্রচেষ্টা একটি ইউটোপিয়ান বৃত্তে আবদ্ধ রইলো। অথচ বয়সের জীর্ণতা নিয়েও প্রবল উৎসাহে অনুভব করেছেন যে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত কৃষিযজ্ঞের অন্ততঃ কিছু না কিছু রূপ এখানে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। আর সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন এদেশের পল্লীতে পল্লীতে, যাতে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ এইসব যন্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বাস্তবায়িত করে তোলা যায়। বহুযুগ পূর্বের প্রাচীন কৃষিপদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং সংঘবদ্ধ কৃষি-রীতির প্রগতিশীল প্রচলনে রাবীন্দ্রিক ঐকান্তিকতা জরাজীর্ণ সামন্ত প্রথা বর্জনে ইঙ্গিতগর্ভ এবং সেই সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সংকীর্ণতার উত্তরণে চিহ্নিত। **এর তাৎপর্য পূর্বোল্লিখিত সমাজ-প্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থার ইঙ্গিতে প্রসন্ন।** আমরা তাই বুঝতে পারি, কেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের শ্রেণীগত অবস্থান আধা-সামন্ত-আধা-নব্যধনিক পর্যায়ে হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়গত পরিধিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীলতায় নিহিত, যদিও এ ক্ষেত্রে সেই প্রগতির বিস্তার সমস্যার প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন এবং প্রতিকারের সদিচ্ছায় সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য এই বিষয়-গরিমা মার্কসবাদের তাত্ত্বিক চিন্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

জমি-নির্ভর কৃষক, জমির মালিকানা, জমিদার-মহাজনের শোষণ, ধনের শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে রাবীন্দ্রিক ভাবনা তার স্বদেশচেতনার অঙ্গীভূত। এইসব ভাবনা যেমন সামন্তবাদের প্রশ্রয়ে লালিত নয়, তেমনি শ্রেণী-চেতনার ভাষ্যেও নিষিক্ত নয়। সমস্যার অনুধাবন স্পষ্ট হয়েও সমাধানের প্রশ্নে তা কবির নিজস্ব ভাবনায় আলোকিত, যার মূল কথা মানব-ধর্ম ও মানবিকতা অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববোধ, এবং উচ্চনীচ সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সাম্য। এবং বলা বাহুল্য, রাজনীতি-অর্থনীতির সম্পৃক্ত বৃত্ত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান অন্বেষণের ফলে কবির ঐকান্তিক সদিচ্ছাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ; যেমন হয়েছে দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে, তেমনি ঘটেছে তার পরম মমতা-জড়িত মাটির ভুবনে। অথচ এই মাটির সন্তানদের শ্রীবৃদ্ধি, শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তার ও আন্তরিকতার অভাব ছিলোনা ; এমন কি অভাব ছিলোনা শ্রম, সময় ও সম্ভাব্য অর্থের ব্যবহারে।

তথ্য-নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পল্লীসেবা,' রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৫৬২

২. ঐ, 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত,' ঐ : ৫৮৬, ৫৮৬-৫৮৭

৩. ঐ, শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদবোধন উপলক্ষে কবির 'অভিভাষণ,' রচনাবলী-২৭ : ৫৪৭

৪. ঐ, 'রাশিয়ার চিঠি-৪' রচনাবলী-২০শ (১৩৫২) : ২৮৮, ২৮৪, ২৮৩-২৮৪

৫ ঐ, 'সম্ভাষণ,' রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৫৯৫-৫৯৬

৬ ঐ, 'রায়তের কথা,' রচনাবলী ২৪শ (১৩৭৭) : ৪২৭, ৪২৮, ৪৩০

৭ ঐ, 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী-তে প্রদত্ত 'সভাপতির অভিভাষণ,' রচনাবলী-১০ম (১৩৪৮) : ৫১৮, ৫১৮-৫২১

৮. ঐ, 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', রচনাবলী-৩য় (১৩৬৩) : ৬১৫-৬১৬

৯. ঐ, 'শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও ইতিহাস,' রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৫৫২-৫৫৮

১০ ঐ, 'পল্লীপ্রকৃতি', ঐ : ৫৩৬

১১. ঐ, 'উপসংহার-রাশিয়ার চিঠি,' রচনাবলী-২০শ (১৩৫২) : ৩৪২-৩৪৩

১২. প্রতিমা দেবীকে লিখিত চিঠি (চিঠিপত্র-৩).

১৩. রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি (চিঠিপত্র-২)

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. 'রাশিয়ার চিঠি-১৪.' রচনাবলী-২০শ (১৩৫২) : ৩৩০

১৫. এ সম্পর্কে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের ১৩৫৮ (ফাল্গুন) সংস্করণ, পৃঃ ১৫০ দ্রষ্টব্য।

১৬ বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮) : ৩০২

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাশিয়ার চিঠি-৫,' রচনাবলী-২০শ (১৩৫২) : ২৯৩

বিশ্বচৈতন্যের ঘাটে

দেশকালের সীমানা পেরিয়ে পর্যটনের সাধ ছিলো রবীন্দ্রনাথের। বাংলাদেশ, বাঙালিয়ানা ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে উজ্জ্বল গর্ব সত্ত্বেও তাঁর স্বাদেশিকতার চেতনা উগ্র জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতায় আশ্রয় চায়নি কোনদিন। বরং সে-চেতনার অবস্থান ছিলো বরাবরই ফ্যাসিবাদের বিপরীত মেরুতে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনা একদিকে স্বদেশে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায়, অন্যদিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও নারী স্বাধীনতার আহ্বানে ; ধর্মীয় অন্ধতা, সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে এবং সর্বোপরি সত্য ন্যায় ও কল্যাণের ভিত্তিতে স্বাদেশিকতার প্রকাশে বাঙ্ময়। ধর্ম, সম্প্রদায় বা শ্রেণীনির্বিশেষে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণী-সাহচর্য যেমন তাঁর স্বাদেশিক-বোধে পরিস্ফুট, তেমনি তা অনুরূপ বা ততোধিক আবেগে বিশ্ববোধে আশ্রিত। জাতীয়তাবোধের যে-একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে বিচরণের প্রয়াস বা উগ্রতা থাকে, তা রাবীন্দ্রিক স্বভাবধর্মের বড় একটা অনুকূল ছিলোনা ; বিস্তীর্ণ হাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার রক্তে সহজাত উপকরণ রূপে আপন আবাস তৈরি করে নিয়েছিলো বলে মনে হয়। পথের ডাক তাই অতি সহজেই তাঁর রক্তে ঢেউয়ের দোলায় উচ্চকিত হয়ে ওঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-ধর্মের নিজস্ব পথে এবং চিন্তা-ভাবনার আলোকে জাতীয়তা-বোধের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় বিচরণ করতে চেয়েছেন। একালের রাজনৈতিক সংজ্ঞার নিরিখে এক্ষেত্রে 'আন্তর্জাতিকতা' শব্দটির ব্যবহারে কারো কারো আপত্তি থাকলেও বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনার পরিশেষে আমরা শব্দটির প্রয়োগ-সংক্রান্ত যথার্থতা বিচার করতে সমর্থ হবো। সেকালে নিজবাসভূমে পরবাসী হবার বেদনায় নয়, হৃদয়ের প্রেরণা ও মননের ঔদার্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি বিশ্বের ঘরে

ঘরে চেনা ঠাঁই খুঁজেফিরেছেন, চেয়েছেন প্রাণের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ ও সাহচর্য :

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"
('প্রবাসী' : উৎসর্গ)

বিশ্বের ঘরে আপন ঘরটির সন্ধানে এই যাত্রা ছিলো তাঁর প্রাণধর্ম। অন্তরে লালিত প্রত্যাশা, অচেনা বিশ্বকে আপন ভুবনের চেনার রঙে উদ্ভাসিত করা আর সেখানে দু-চোখ ভ'রে 'অপরূপ'কে দেখার প্রত্যাশা, নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হবার বাসনা। এই 'অপরূপ' আকাশচারী কিছু নয়, মানুষেরই বিচিত্র রূপ :

> "মানুষের যে দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড়ো যে, কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলা-ফেরা বাঁধা পায়। জোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে।"(১)

এই পথচলার নেশা শুধু বলাকার কাব্যিক গতিবাদ নয়, ছন্দিত গতিময়তা নয়, অণুপরমাণু ঘিরে কলরোল বা আবর্তন নয় ; এ যেন প্রাণের নেশা, জীবনের গতিধর্ম, পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের নেশা :

> "প্রাণ আপনি চায় চলিতে, সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেই জন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম।"(২)

পরিণত বয়সেই নয়, তরুণ বয়স থেকেই এই আহ্বান তাঁর রক্তে ধ্বনিত হয়েছে। নিতান্ত তারুণ্যে ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'বালক' মাসিক পত্রে প্রকাশিত নিবন্ধেও কবি সাহিত্য-প্রসঙ্গে বিশ্বজনীনতার আদর্শ তুলে ধরেছেন। বুদ্ধিজীবীর সচেতনবোধ এক্ষেত্রে পরিত্রাণ পায়নি বিশ্ববীক্ষণের দায় থেকে :

> "আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী

> হইতে পারে, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধুলার মতো আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।"(৩)

অবাধ যৌবনের দুর্দম প্রাণচঞ্চলতা তরুণ কবিকে জাতি-ধর্ম, শুচি-অশুচি, সব ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে বিশ্ববৃত্তে জীবনবীক্ষণে দীক্ষা দিয়েছিল, তাই কবির আন্তরিক বাসনা ঃ

..."ইচ্ছা করে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্র দুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন,"...
('দুরন্ত আশা' ঃ সোনার তরী)

এই দুরন্ত বাসনারই পরিণত বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করি কবির পরবর্তী জীবনে বিশ্বমানবতার বিভিন্ন ভাষ্যে। পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে বিষয়ান্তরে কবি একই মুখ্য আদর্শের বাতি জ্বালিয়ে গেছেন, যার মূলকথা মানব কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি—এবং যে আদর্শ বিশ্বে আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হলোনা, যার জন্য সৎ মানুষের লড়াই আজো অব্যাহত।

মানব-সম্পর্ক কবির চোখে সবচেয়ে বড় সম্বন্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো বলেই বয়সের ভারে জীর্ণদেহে নিয়ত মৃত্যুর ডাক শুনে-ও গভীর বিশ্বাসে উচ্চারণ করেন ঃ 'এ বিশ্বেরে ভালবাসিয়াছি'। পৃথিবীর প্রতিটি অঙ্গ ভালোবাসার উত্তাপে সমৃদ্ধ করে দিয়ে বলতে চান ঃ 'মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি।' বাংলার মাঠঘাট মানুষের প্রতি যার ভালবাসা ছিলো অপরিসীম, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে যার গর্বের অন্ত নেই, বিশ্বচৈতন্যের ঘাটে সমর্পিত সেই সত্তায় একক ভাবে বাংলার মুখ যেন আর ভেসে উঠেনা ; অথবা বলা যায় বিশ্বভুবনের ক্যানভাসে বাংলার মুখ একাকার হয়ে যায়, আর তাই শিল্পী কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঃ 'আমি পৃথিবীর কবি।' 'বিদেশের ভালোবাসা' তখন বিশেষ মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দেশ ও জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে এই যাত্রার নামই রাবীন্দ্রিক আন্তর্জাতিকতা। কবির এই আন্তর্জাতিক চেতনা বিশ্বজনীনতায় ও মানব প্রীতিতে সমৃদ্ধ বলেই রবীন্দ্রনাথ এত সহজে দেশকালের সীমানা পেরোনোর স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন।

আরব-দুনিয়া ভ্রমণ-রত কবির বাগদাদে সম্বর্ধনার জবাবে পঠিত ভাষণে এই বিশ্বশান্তি ও মানব-মৈত্রীর আদর্শই ধ্বনিত হয়েছে :

> “আমরা যে দেশেরই সন্তান হইনা কেন, আমাদের জীবনের এই এক উদ্দেশ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও মৈত্রীস্থাপনের এই সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের পাকা ভিত্ গাঁথতে হবে। মানব জাতিকে আত্মঘাতি সংগ্রাম ও উম্মত্ত কুসংস্কারের বর্বরতা থেকে রক্ষা করবে এই মিলনের উপনিবেশ। নূতন যুগের সূচনা করব আমরা—শুভবুদ্ধির যুগ, সহযোগিতার যুগ, যার মধ্যে ভাবের পরস্পর আদানপ্রদানের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিপুল ঐশ্বর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।”(৪)

কবি-সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে আপন মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই সাহিত্যের উদ্দেশ্য-নির্ভর ও মানব কল্যাণে প্রয়োজনের ভূমিকা গ্রহণের স্বপক্ষে সোচ্চার হলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের ভাববিলাস নয় শুধু, শান্তি সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিকতার রাজনৈতিক প্রয়োজন-নির্ভর আহ্বানে উদাত্ত হয়ে উঠলো কবির কণ্ঠ :

> “আজ আরবসাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে। আপনাদের মহানুভব ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আমি আপনাদের অনুরোধ করি—মানুষে মানুষে প্রীতির আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ, প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের আদর্শ আজ আপনারা সকলের সম্মুখে প্রচার করুন। আমাদের ধর্মসমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃহত্যার বর্বরতায় কলুষিত। তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধিজনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম করে আপনাদের কবিদের আপনাদের চিন্তাবীরদের বাণী আমাদের দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুন।
>
> “স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অভাব মোচন করাতেই জাতীয় আত্মপ্রকাশের সকল দায়িত্ব শেষ হয়না—দেশকালের সীমানা অতিক্রম ক’রে আপনাদের বাণী পৌঁছনো চাই সেখানে যেখানে মনুষ্যত্বের নৈতিক সমস্যাগুলি আপনাদের বিচার ও বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।”(৪)

এমনি করে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-চেতনাকে আন্তর্জাতিকতার সাগর পাড়ি দেওয়ালেন, যেখানে ধ্বনিত হবে কবির বহু-আকাঙ্ক্ষিত “বীর্যের বাণী, মিলনের বাণী ধর্মকে কল্যাণের যোগে শ্রদ্ধা করবার মানবোচিত শুভবুদ্ধির বাণী।” হিংসায় উম্মত্ত আজকের পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী কিংবা নয়া সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতার বিরুদ্ধে জাগ্রত আফ্রো-এসিয়া তথা শান্তিকামী

বিশ্ববাসীর অভিবষ্ট আদর্শের আহ্বান শোনা গেলো বাংলার কবি-কণ্ঠে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে (১৯৩২ খৃষ্টাব্দে)।

এশিয়া ভ্রমণের সময় পথে পথে চোখ মেলে দেখে, কান পেতে শুনে কবির প্রাণে উচ্চকিত আশার জলতরঙ্গ বেজে উঠেছিলো উপনিবেশী শাসনে রক্তাক্ত এশিয়ায় নবজাগরণের প্রত্যাশায়। তাঁর চোখে পড়েছে, 'এশিয়ার নাড়ীতে চাঞ্চল্য।' ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী বাধা অতিক্রম করে এশিয়ার জাগরণে কবি তাঁর জরাহত রক্তে অনুভব করেছেন উল্লাস। নব্য তুর্কির আবির্ভাবে পরিতৃপ্তির ঢেউ আছড়ে পড়েছে রক্তে :

> "কামালপাশার নায়কতায় নূতন তুরুস্কের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল আঙ্গোরা রাজধানীতে। নব্যতুরুস্ক একদিকে যেমন সবলে য়ুরোপকে নিরস্ত করলে আর একদিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে বাহিরে। কামালপাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরুস্ককে মুক্তি নিতে হবে। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্‌বোধন সকলের আগে চাই।"(৫)

এই নব্য তুর্কি সবল কণ্ঠে ঘোষণা করলো : Mediaeval principles must give way to secular laws. কবি দেখতে পেলেন নবযুগের আহ্বানে এশিয়ার দেশে দেশে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার আদর্শের ঢেউ :

> "দেখা যাচ্ছে ঈজিপ্টে তুরস্কে ইরাকে পারস্যে সর্বত্র ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায় মুসলমানের সীমানায়।"(৬)

ইংরেজ কর্মচারীর কূটবুদ্ধিজাত বক্তব্যের জবাবে জেরুজালেমের বহুনিন্দিত মুফতির কণ্ঠেও রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রশ্নে উদার-মানসিকতার ঝলসানি, যা গণতান্ত্রিক জাতীয়তার ঔদার্যে সমৃদ্ধ : "For us it is an exclusively Arab, not a Mohammedan question. Here, there are no distinction between Mohammedan and Christian Arabs."৫

জাতীয়তার সুস্থ ও মহৎ বিকাশের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিকতার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার আদর্শ রবীন্দ্রমানসে উপস্থিত ছিলো বলেই পৃথিবীর পথে বেরিয়ে এসেও দেশের রাজনৈতিক সমস্যাবলী বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রশ্নটি বরাবর তার মনে কাঁটার মতো জেগে ছিলো, হয়তো বা রক্তক্ষরণেরও বিরাম ছিলোনা। তাই যেখানে গেছেন, সেখানেই দেখতে

চেয়েছেন সমস্যাটি সমাধানের কোন সূত্র ধরা পড়ে কিনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা তাঁর মনে এমন গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করেছিলো যে দুবছর পর আরব-দুনিয়ায় এসেও সম্প্রদায়গত বিরোধের প্রশ্নে সোভিয়েট রাশিয়ার অনুসৃত আদর্শের কথা মনে পড়েছে নিশ্চিত ভাবে ঃ

> “বহুজাতি-সংকুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে যেটা নিত্যই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয় সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটেনা সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়।”(৬)

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা সম্পর্কে বিজ্ঞান-নির্ভর পরিচ্ছন্ন চেতনার অধিকারী ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন চেয়েছেন জাতীয়তার সংস্কারমুক্ত শ্রীবৃদ্ধি, তেমনি অন্যদিকে চেয়েছেন তাদের যুক্তিগ্রাহ্য মনের বিজ্ঞান সাধনা ও ব্যবহার ঃ

> “ভৌতিক জগতের প্রতি সত্য ব্যবহার করা চাই, এই অনুশাসন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের, না করলেই বুদ্ধিতে এবং সংসারে আমরা ঠকব। এই সত্য ব্যবহার করার সোপান হচ্ছে মনকে সংস্কারমুক্ত করে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভৌতিক তত্ত্বগুলি উদ্ধার করা।”(৫)

তাঁর বিজ্ঞানমুখী মনের নৈয়ায়িক ব্যাপ্তি এবং সচ্ছল ঔদার্যই তাঁকে জাতীয়তার লেজুড়বৃত্তি করা কিংবা তার গণ্ডিবদ্ধ পরিসরে আবদ্ধ থাকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। জন্মদিনে পারসিক বন্ধুদের আপ্যায়নের জবাবে তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন ঃ

> “আমি প্রথম জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের—আমি দ্বিজ।”(৭)

রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর নিজেকে ‘ব্রাত্য, পংক্তিহারা ও জাতিহারা’ বিশেষণে আপন পরিচয় ঘোষণা করেছেন। এবং প্রসঙ্গতঃ এ ধরনের তির্যক মন্তব্যও করেছেন যে হয়তো জগন্নাথের মন্দিরে তাঁর মতো ব্রাত্যের প্রবেশাধিকার মিলবে না।

এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের উজ্জীবনে আনন্দিত রবীন্দ্রনাথের এই সতর্ক বোধ সুতীক্ষ্ণ ছিলো যে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ অভিনন্দন-যোগ্য হলেও তার উগ্রতায় ভয়ের কারণ নিহিত। ইউরোপ থেকে উগ্র জাতীয়তাবোধের এশিয়ায় অনুপ্রবেশের ভয় তাঁর মনে ঠিকই বাসা বেধে ছিলো, যে জন্য জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসিবাদী রূপান্তর চিনতে কষ্ট হয়নি তাঁর :

> "নতুন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব এশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে একদিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজম, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালার ভাবীকালের অগ্নিকাণ্ড কেবল সময়ের অপেক্ষা করে।...কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখলনা, কী করে মারতে হয়, য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে।"(৫)

১৩২৩ সালে জাপান পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বলা বাহুল্য, কবি চৈতন্যে প্রসন্নতার কোন ছায়াপাত ঘটায়নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাপান তার জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে চায়। তাই "জাপান ইউরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে।" কিন্তু সেই শিক্ষা ছাপিয়ে উঠেছে তার জাতীয়তার উগ্রতা, যা প্রতিবেশীর জন্য ভয়াবহ :

> "সেখানকার মন্দিরে সবচেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সহজেই আধুনিক জার্মানীর শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে ; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত।"(৮)

পরম বিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য করি যে ফ্যাসিবাদী উগ্রতার দিকে জাপানের প্রবল আসক্তি কবি বহু পূর্বেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে সে সম্ভাবনার উল্লেখ দেখতে পাই জাপানযাত্রীর ডায়েরীতে, ১৩৩৯-এ আরব জগতে এসে প্রসঙ্গতঃ সেই বিষাক্ত সম্ভাবনাকেই আঘাতে সুস্পষ্ট করে তুললেন। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন জাপানী ফ্যাসিবাদের বর্বরতাকে ; এ যেন রাজনীতির মঞ্চে ভবিষ্যত-দর্শন। অনায়াস-লব্ধ

প্রজ্ঞায় কবি দেখতে পেয়েছিলেন যে জাপান তার "স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়-রূপে" তার ধর্মকেও ব্যবহার করেছে। গভীর বেদনায় আমরা দেখতে পাই আমাদের এই কবির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা কী অদ্ভুত-ভাবে বাস্তবায়িত হয়ে উঠলো চীনে ও কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী জাপানের লোলুপ বর্বরতায়। আরো এক বছর পর অর্থাৎ ১৩৪০ সালে প্রতিবেশী দেশে জাপানী ফ্যাসিবাদের উগ্র প্রসার সম্পর্কে তিক্ত, ক্ষুব্ধ কবি 'কালান্তরে' কশাঘাত করলেন সেই বর্বর শক্তিকে ঃ

> "সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বল দৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে।...যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে, তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা।...আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।"(৯)

ক্ষুব্ধ, আহত, রক্তাক্ত কবি-চৈতন্যে এই সব অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ফলশ্রুতি রূপে দেখা দিল ফ্যাসিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা সম্পর্কে সুতীব্র ঘৃণা। বলা বাহুল্য, এই ঘৃণা তার দীর্ঘকালীন লালিত মানবিক-চেতনার অভিব্যক্তি বই আর কিছু নয়।

বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের শেষ এক-দেড় দশক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৩৪৪ অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত 'কালান্তর'-এ ফ্যাসিবিরোধী ক্ষুব্ধ ঘৃণাই নয়, আসন্ন মহাযুদ্ধের অশুভ সংকেত যেন রক্তে ধারণ করে কবি ফ্যাসি-বিরোধী শিল্পীগোষ্ঠীর এক উজ্জ্বল কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত হলেন। বিশ্বশান্তি ও বিশ্ববিবেকের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রোষ-দীপ্তিতে ঝলসে উঠেছেন, জাপানকে অভিযুক্ত করেছেন ১৯৩৮-এ লেখা 'বুদ্ধভক্তি' (নবজাতক) কবিতায় এই বলে যে "ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে"।(১০) ফ্যাসিস্ট জাপানের বুদ্ধপূজার ভণ্ডামিতে তিক্ত কবির বক্তব্য যেন একালের ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতা স্মরণে এনে দেয়, বোঝা যায় যুদ্ধবাজ বর্বরদের পৈশাচিকতায় দেশকাল ভেদে বিশেষ কোন তারতম্য সূচিত হয় না ঃ

"নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাস্যে পৈশাচী রঙ্গ,

মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষ বাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিঃশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।" (বুদ্ধভক্তি)

ঠিক এক যুগ আগে অনুভূত অশুভ শংকা আশ্চর্য বাস্তবতায় যুদ্ধবিরোধী-ফ্যাসিবিরোধী কবিতা-চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এ সময়কার কবিতায় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে বিপুল ঘৃণা এবং শেষ পরিণামে বিশ্বশান্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা দীপ্ত আবেগে ফুটে উঠেছে। উগ্রজাতীয়তার ধ্বংসের মধ্যেই কবি প্রায়শ্চিত্তের সমাপন এবং বিশ্বশান্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন :

"সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল-বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।"
('প্রায়শ্চিত্ত' : নবজাতক)

এতেই নিরস্ত হননি রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে চীনে জাপানের সামরিক নীতির সমর্থন করে জাপানীকবি ইয়োনে নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দেন, তার জবাবে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) লেখা চিঠিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে :

> "ফ্যাসিষ্ট ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়ায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আপনি আমার সাথে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ আপনি চীনের অসংখ্য নরনারীর উপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নীরব।...একথা সত্য যে ধার্মিক রণদেবতারা তাদের হত্যাকাণ্ডের এরূপ ব্যক্তিগত সমর্থন লাভ করে এসেছে, এবং বিপুল নির্যাতন ও নরমেধ যজ্ঞের জন্য চিরকাল ধর্মের সাথে বিশেষ আত্মীয়তা স্থাপন করেছে।...আজ জাপান নরমুণ্ডের বিজয় স্তম্ভের উপর নূতন এশিয়ার স্বপ্নে বিভোর।...
>
> "আপনার পত্রে 'এসিয়ার জন্য এসিয়া' নীতির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা একটি রাজনৈতিক চাল মাত্র।...যে সরকার ধ্বংসের কার্যে রত, তার কৃপা ও অনুকম্পার ছায়া-তলে বসে যারা জীবন যাপনের সুখ সাচ্ছন্দ উপভোগ করেন, এবং অব্যাহতি লাভের সহজ যুক্তিবলে দায়িত্ব এড়িয়ে চলেন, তাদের কার্য দেখেই মনে হয় বর্তমান বুদ্ধিজীবীর দল মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। একজন শিল্পী তার ধর্ম ও বিবেকের মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে পারেন না।"

এর পরও একই বিষয়ে নোগুচির দ্বিতীয় চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ আরো স্পষ্ট ভাষায় বললেন (২৯. ১০. ৩৮) :

> “এশিয়ার অন্যান্য জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্ববশে আনার অনুকূলে আপনার সরকারের নীতি আমি কোনো ক্রমেই সমর্থন করিনা। স্বদেশের বেদীমূলে অন্য দেশের অধিকার ও সুখ-শান্তিকে বলি দিয়া যে দেশপ্রেম, তাকে আমি দেশপ্রেম বলিয়া স্বীকার করিনা।...যদি আপনার দেশের দরিদ্র লোকেরা শোষিত না হয়, এবং শ্রমিকগণ মনে করে যে তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে কম্যুনিজমকেও আপনার ভয় করিতে হইবেনা।”

জাপানই নয় শুধু। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর নিষ্ঠুর বর্বরতায় শান্তিবাদী কবির রক্তঝরা চৈতন্যে ধৈর্য-ধারণ যেন আর সম্ভব হচ্ছিল না :

> “য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যেসব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মানি। কিন্তু আজ সেখানে এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হলোনা।”(৯)

হিটলার-জার্মানীর য়িহুদি-মেধ এবং পুস্তকমেধ যজ্ঞের ভয়াবহতা কি কবির চেতনায় অশুভ ছায়ার মতো দুলছিলো। কিন্তু জার্মানীর এই তথাকথিত আর্য-আভিজাত্য এবং অতিমানবতার বিশুদ্ধ ভয়ালতার অশুভ গতি ও পরিণতি তো কবি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেও লক্ষ্য করতে ভুল করেননি :

> “আজ ক্ষুধিত জর্মানির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্যে লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।”(১১)

পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিস্টদের সমরসজ্জা দেখে ক্ষুব্ধ কবি সরোষে আজীবন লালিত বিশ্বাসের শিকড় ধরে টান দিয়ে চীৎকার করে ওঠেন (১৯৩৩ সালে) :

> “মনুষ্যত্বের ’পরে বিশ্বাস কি ভাঙ্গতে হবে—বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা।”(৯)

শক্তি প্রয়োগে দ্বিধাহত কবিকে বড় করুণ রক্তঝরা অভিজ্ঞতার দায়ে লিপিবদ্ধ করতে হোল 'য়ুরোপীয় শাসনের অকথ্য বিভীষিকা, আয়ারল্যাণ্ডে রক্তপিঙ্গলের উন্মত্ত বর্বরতা, সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রের দুইহাতে পারস্যের টুঁটি চেপে ধরা' প্রভৃতি নারকীয় ক্রিয়াকলাপের বর্বরতা। সৌন্দর্যতত্ত্বে আকৃষ্ট কবির দর্শন সাম্রাজ্যবাদের ভয়াল রূপ দর্শনে মানব-অস্তিত্বের সংগ্রামকেই বড় বলে জেনে নিতে বাধ্য হল। তাঁর চিনতে কষ্ট হয়নি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তার অন্তর্নিহিত ফ্যাসিবাদী শক্তির উৎকট বহিঃপ্রকাশ। সাম্রাজ্যের প্রসার তথা শাসকী প্রভুত্বের দিগন্তব্যাপী সম্প্রসারণে ব্যগ্র য়ুরোপীয় দেশগুলোর প্রতি নিক্ষিপ্ত কবির ঘৃণা ও প্রতিবাদী ঘোষণা তাই এমন নগ্ন ভাষায় পরিস্ফুট। সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের শিকার আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর স্বপক্ষে বার বার কবিতায়, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, ভ্রমণকাহিনীতে উচ্চারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ধিক্কার এবং ঐসব দেশের প্রতি মমত্ববোধ। সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতাকে উপমিত করেছেন মধ্যযুগের বর্বর তাতারদের রক্ত-পিপাসার সাথে। এই অমার্জনীয় অপরাধ তথাকথিত গণতন্ত্রের পতাকায় ঢেকে দিতে পারেনি :

> "ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয়নি—এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে।
>
> "আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য ভিড় করে আসে।"(৯)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যযুগীয় নির্যাতন ও বর্বরতার মুখোশ খুলেই ক্ষান্ত হননি কবি। শিল্প-সাহিত্যে মননশীলতার জন্য প্রশংসিত ইংরাজও এই উন্মোচনের প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা পেলোনা। উপনিবেশিক শক্তির অধীনে শোষিত দেশের জনশক্তির একাংশও যে সচেতনতার অভাব, সাম্রাজ্যবাদী চাপ ও অর্থনৈতিক দাস্যবৃত্তির প্রয়োজনে প্রতিবেশী দুঃখী দেশের রক্তমোক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে, চীনের প্রতি ভারতীয় উপনিবেশ থেকে শক্তি

প্রয়োগের নগ্নতায় সে তথ্য নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তিনি পাঞ্জাবী সৈনিকের চীনাদের প্রতি নির্লজ্জ ব্যবহার এবং সামগ্রিকভাবে সৈনিক ও রাজভৃত্যদের কদর্য ভূমিকার প্রতি তীক্ষ্ম তর্জনী নির্দেশ করেছেন। কবির এই সচেতন ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> "চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে।...নিয়মের সহজ দাবি যতদূর পেঁছায় এরা সহজেই তাকে বহুদূরে লঙ্ঘন করে যায় ; তাতে আনন্দ পায়, গর্ববোধ করে।
> "চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকং কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এঁদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে।"(১২)

এই মানব-প্রেমিক কবি ১৯২৫ সালেই দেখতে পেয়েছিলেন মানব বিশ্বের আকাশে যুদ্ধের কালোমেঘের ঘনঘটা। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে 'তীক্ষ্ম-চঞ্চু ইংরেজের' বলদর্পিত মহড়া, পূর্বপ্রান্তে জাপানের শক্তি বৃদ্ধির প্রবল প্রয়াস, পীড়িত এশিয়ার দেশে দেশে অস্থিরতা—এমনি একটি সংকট ও আসন্ন সংঘাতের সম্ভাবনায় উদ্বিঘ্ন কবি শিল্পের দায়ে রাজনৈতিক ঘটনা-বলীর প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখেননি, বা রাখতে চাননি। দেখেছেন দিকে দিকে দুর্বলের অস্থিরতা আর প্রবলের রক্তচক্ষু :

> "চীনও তার দেওয়ালের চারদিকে সিঁদ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল, তারা চীনের এই চৈতন্য লাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন সে (ভারতবর্ষ) য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে করে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে মারতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে।...এতে আশ্চর্যের নেই যদি ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তাহলে নিঃশ্বাস ফেলে বলবে : *I* miss my best servant. "(১২)

আফ্রো-এশিয়ার উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রক্তলোভী পদ-চারণার পাশব রূপ এমনি করেই কবি নির্মোহ সততায় উদ্ঘাটন করেছেন বিভিন্ন কবিতায়, প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে। বিশুদ্ধ সাহিত্যের ধারকদের মত শিল্পের অজুহাত তুলে রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে শিল্পের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে অনীহা প্রকাশ করেন নি। বরং তাঁর উন্মোচন প্রক্রিয়া ছিলো ঋজু এবং সরল, তীব্র অথচ মানবিক উত্তাপে উজ্জ্বল (বিশেষতঃ প্রবন্ধে) :

> “সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতী উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহারা একবাক্যে সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে কোনো-প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে ‘লিঞ্চ’ করাই শ্রেয়।”(১৩)

সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিবাদের প্রস্তুতি ও সজ্জায় উদ্বেল কবিচিত্ত ১৯৩৬-’৩৭ সালের পরিধিতে অনেকগুলো ফ্যাসিবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী কবিতার মধ্যে সৃষ্টি করলো সেই বহু পরিচিত ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি, যার তিন-তিনটি পাঠ উৎসাহী পাঠকের আনন্দের কারণ হবে। এখানেও রুদ্র-তীব্র উন্মোচন, যদিও শেষ কয়টি পংক্তি সম্পর্কে কারো কারো আপত্তি বহুল-উচ্চারিত, যাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন : কেন ক্ষমা করা হবে অত্যাচারী সাম্রাজ্যলিপ্সুকে ? কিন্তু রচনাবলীতে উপস্থিত কবিতাটির সাথে তার অন্য দুটো প্রকাশিত পাঠান্তর মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে উক্ত পংক্তি কয়টির বক্তব্য সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমা নয়, অত্যাচারিতার কাছে যুগান্তরের কবির ক্ষমা ভিক্ষা (এ কি সংগ্রামে-মিছিলে-সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়তে না-পারার রাবীন্দ্রিক অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতার প্রতীক ?) :

“এসো তুমি যুগান্তের কবি—
ওই চির নিপীড়িতা মানবীর কাছে,
    ওই অবমানিতার দ্বারে,
        ক্ষমা ভিক্ষা করো।”
(বিশ্বভারতী পত্রিকা”য় প্রকাশিত পাঠ, ১৩৫১)।

বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে অপমানিতার কাছে যুগান্তরের কবির ক্ষমাভিক্ষার অর্থ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের অভাব নয়। কারণ, যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ বরাবরই সোচ্চার ছিলো। উল্লেখ্য যে, ‘পত্রপুট’-এর ১৭ সংখ্যক কবিতা (‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি’—১৩৪৪)র গদ্য ছন্দে রচিত পাঠ তার একবছর পরে (১৯৩৮) রচিত (‘বুদ্ধভক্তি’—নবজাতক) পাঠ-এর মতোই ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণাদৃপ্ত উপহার, যা নিমেষে ভিয়েতনামে মার্কিন যুদ্ধ-বর্বরতার চিত্র তুলে ধরে (প্রসঙ্গতঃ বার্ট্র্যান্ড রাসেল রচিত ‘ওয়ার ক্রাইমস ইন ভিয়েতনাম’-এর কথা মনে পড়ে যায়)। কবিতাটির দু-একটি পংক্তি পাঠকের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে সহায়ক হবে, যদিও কবিতাটি সম্পূর্ণ-উদ্ধারণযোগ্য) :

"যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
বেরোল দলে দলে।...
"পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।
"ওদের এইমাত্র নিবেদন. যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যা মন্ত্র দিতে
যেন পারে বিষ মিশিয়ে দিতে নিঃশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে।"

এ যেন সমসাময়িক কালে লেখা 'আফ্রিকা' কবিতার বিনম্র উপসংহারের ভ্রান্তিক্ষয়। রবীন্দ্ররচনার সতর্ক পাঠক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এমনিতর জোয়ার-ভাটার টানাপোড়েন লক্ষ্য করতে পারবেন পূর্বাপর। তাই বরাবর একটি কথাই রবীন্দ্র-রচনার পাঠশেষে আমাদের প্রত্যয়ে ধ্বনিত হতে থাকে যে একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের পরিচিতি এঁটে রবীন্দ্র-মানসকে চিহ্নিত করা প্রায় অসম্ভব, এবং তাতে অতিভক্তি বা অস্বীকৃতি—এই দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩০ সালে রাশিয়া-ভ্রমণ কবির আন্তর্জাতিক চেতনা গুণগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের দস্যুবৃত্তির প্রতি কবির বিরোধিতা ব্যাপ্তি ও গভীরতায় প্রতিরোধের পর্যায়ে উঠে এসেছিল। এবং এই গুণগত পরিবর্তনের ফলেই কবির শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী পর্বের আন্তর্জাতিক বোধ এবং 'হিউম্যানিজমের' ধ্যান-ধারণা পার হয়ে সৃষ্টি হতে পেরেছিল বহুসংখ্যক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কবিতা, প্রবন্ধ ; বিত্তহীনদের স্বপক্ষে নাটক ('কালের যাত্রা'), 'কালান্তর' কিংবা 'সভ্যতার সংকট'-এর মতো রচনাবলী। এক্ষেত্রে আমরা কবির উল্লিখিত 'হিউম্যানিজম' বা মানবতাবাদী চিন্তাসূত্রের কিছুটা পরিচয় নিতে পারি।

বিশ্বভারতী পর্বে, বিশেষ করে বিশের দশকে, রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক ভাবনা নিয়ে ঐকান্তিকতার সাথে মেতে উঠেছিলেন, কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি তাঁকে অবিরাম পীড়া দিচ্ছিল। কবির তাই স্বপ্ন ছিলো যাতে শান্তিকামী বিশ্ব আরেকটি মহাযুদ্ধে তথা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে

না পড়ে। তাঁর বিশ্বভারতী ছিলো, তাঁর চোখে, শান্তির অন্বিষ্ট স্থান, সর্বজাতির মিলনকেন্দ্র, মহামানব তথা মহৎ মানুষের পীঠস্থান। আমাদের সবিস্ময় দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার উদ্দেশ্য, যার মূল কথা শান্তিনিকেতনে "মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে যুগ-সাধনার প্রবর্তন করা।"(১৪) এর অর্থ কবির সর্ব-মানবিকতা বোধের বৈশিষ্ট্য "মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে পৃথিবীর সামনে" তুলে ধরবার পক্ষপাতী।(১৪) জাতীয়-চেতনার সংকীর্ণতা পার হয়ে সেখানে পেঁাছেছিলেন কবি ঃ

> "এখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে।"(১৫)

১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতিষ্ঠানটিকে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী "সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ" করা হয়, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে ভাষণ দেন, তার অংশবিশেষ প্রতিষ্ঠানের ভাবাদর্শ বুঝতে বিশেষ সহায়ক হবে ঃ

> "সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি। ভারত শান্তির অনুধাবন করেছে, চীন দেশও করেছে। যদি মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক ফেলোশিপ স্থাপিত হয়, তবে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্ভব হবে, নয়তো হবেনা। কনফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপের উপর স্থাপিত ; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। "আমাদের বিশ্বভারতীতে রাষ্ট্রনীতি, সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইন্‌ষ্টিটিউশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই ষ্টাডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে।"(১৬)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সাধনা সম্পর্কে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করলেন মাত্র দুটো বাক্যে ঃ "আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণতঃ মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। যাকে সংস্কৃতি বলে, তা বিচিত্র ; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল।" তাই শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-আশ্রমকে তিনি আদর্শগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত করেন।

বেশ বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বিশ্বমানবতাবাদের চর্চাই করতে চেয়েছেন, এবং এই আদর্শবাদী চিন্তার সাথে তিরিশোত্তর বিশ্বপরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিকতার সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার একটা গভীর দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে আত্মবিরোধের জটিলতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের মস্তবড় একটি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম—'সততা' যা কবিকে বহু সমস্যা ও বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। এই বৈশিষ্টে সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই, দুচোখে যা দেখেছেন, বা তাঁর কাছে যা কিছু ভালো বা মন্দরূপে প্রতিভাত হয়েছে, নির্দ্বিধায় সে সম্পর্কে আপন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এতে করে কখনো আত্মবিরোধিতা বা আত্মসমালোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, কিন্তু তিনি বিচলিত হননি তাতে। তাই বিশ্বভারতী বক্তৃতামালায় অনায়াসে বলতে পেরেছেন ঃ

> "স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, **একজাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল।** এমন কি যেসব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি, মানুষ নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।"(১৭)

এমনি করে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাকে ফ্যাসিবাদের সমীকরণে সিদ্ধ করলেন, এবং স্বভাবতঃই বোঝা যায় যে রবীন্দ্র-মানসের পক্ষে জাতীয়তার সবিশেষ কাঠামোয় আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। এই বোধ অন্তরে বহন করেই রবীন্দ্রনাথ বরাবর আন্তর্জাতিকতাবাদী ; এবং জাতীয়তার চেয়ে বিশ্বজনীনতার প্রান্তরে পদচারণায় তার চরণ সচ্ছন্দ ও বলিষ্ঠ। এই মনোভঙ্গির ফলেই তিনি জাতীয়তার সীমারেখা আন্তর্জাতিক মানচিত্রে বিলুপ্ত করে দিতে চাইলেন, বিশ্বভারতী যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতীক মাত্র ঃ

> "আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। মানুষ শুধু কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয় ; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয় সাধন হয়নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়।"(১৮)

পরস্ব লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির মহিমায় ধনের বৈষম্য সৃষ্টি তাঁর কাছে সামাজিক উপদ্রবরূপে ধরা দিয়েছিল বলেই এই বক্তৃতার সাত বছর পর সোভিয়েট রাশিয়ায় ভ্রমণকালে সেখানে “ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব” তাঁর কাছে অভিনন্দনযোগ্য মনে হয়েছে।

অনায়াসে সমর্থন জানাতে পেরেছেন নির্ধনের শক্তি সাধনায় :

> “ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করবো কিসের, রাগ করবোই বা কেন। আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায় দলের।”(১৯)

আন্তর্জাতিকতার যাত্রিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেও সমর্থন জানাতে দ্বিধা করলেন না রবীন্দ্রনাথ, যদিও এই বিপ্লবের রূপরেখা ও চেতনা তাঁর অভিজ্ঞতার এবং চিন্তাভাবনার বাইরে :

> “পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।
>
> “একদিন ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়।”(১৯)

সাত বছর আগে যে বক্তব্যে কবি স্বদেশ চেতনাকে বিশ্বচেতনার অঙ্গীভূত করে সর্বমানবের কল্যাণের ছায়ায় দেখতে চেয়েছিলেন, তার আভাস কি দেখতে পেলেন রুশ বিপ্লবের ছত্রছায়ায়? তা নাহলে জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়ে বিধৃত রুশ বিপ্লবে মানব মুক্তির মহিমাময় সন্ধান বাস্তবায়িত হলো কেমন করে কবির চোখে? যে সময় গোটা বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একমাত্র দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও প্রচার-অভিযান চলছে, সে সময় শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ কবির পক্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুস্পষ্ট সমর্থন সম্ভব হয় কেমন করে, বিশেষ করে সেই শিল্পীর আন্তর্জাতিক চেতনা যদি গভীরতর পর্যায়ে না পৌঁছে থাকে? এ বোধ কবি-চিত্তের অমোঘ সততা থেকে উৎসারিত :

> “এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের

> কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টিকবে কিনা কেউ বলতে পারেনা। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"(১৯)

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে একঅর্থে বিশ্বজাগতিক বিপ্লবের অন্তর্গত এবং জাতীয়তার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সে আবদ্ধ নেই, রবীন্দ্রনাথ এই আন্তর্জাতিক বিপ্লবের বাস্তবতা স্বীকার করে নিলেন। দেশীয় বা জাতীয় সমস্যাকে বিশ্ব সমস্যার অঙ্গীভূত করার মনোভঙ্গি যদি আন্তর্জাতিক চেতনার অভিব্যক্তিরূপে চিহ্নিত না হয়, তবে অন্য কোন্ রূপরেখায় আন্তর্জাতিকতা চিহ্নিত হতে পারে, বিশেষ করে বিশ্বশান্তির আন্তরিক আহ্বানও যখন সেই মনোভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়? কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না রবীন্দ্রনাথ। একজন রাজনীতি-সচেতন শিল্পীর মতন পৃথিবীর নিঃসঙ্গ সমাজতান্ত্রিক দেশটির সমস্যা-সংকট নির্ভুল বাস্তবতায় এবং উষ্ণ মমতায় তুলে ধরলেন সবার সামনে ; উদ্ঘাটিত করে দিলেন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমী-দুনিয়ার ষড়যন্ত্রের মুখোশ ঃ

> "ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙ্গা-চোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের (জার) প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের (কাউন্টার রিভোলুশ্যন) প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে, সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য। এইজন্যে কোনো মতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলছে এদের উদ্যোগ পর্ব। রাষ্ট্রব্যবস্থার সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা, আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।"(২০)

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কোন লেখকের পক্ষেও এর চেয়ে শক্তিশালী-সুযুক্তি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপক্ষে উপস্থিত করা বোধহয় সম্ভব ছিলোনা ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর্জাতিক কবিখ্যাতির (বলা বাহুল্য পশ্চিমী দুনিয়ায়) প্রেক্ষিতেও রাশিয়ার রক্ষাব্যবস্থা সুসংগঠিত করার পক্ষে সমর্থন জোগাতে ভয় পাননি। অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে রাশিয়া কর্তৃক সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তির সারবত্তাই যেন কবির বক্তব্যে সুপ্রমাণিত হয়ে উঠেছে। তথাকথিত বিশ্বশান্তির নামে জাতিসংঘের ভূমিকাও যে সাম্রাজ্যবাদের

স্বার্থে পর্যবসিত, এ তথ্যও রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর সচেতনতায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

> "মনে আছে, এরাই 'লীগ অব নেশনস'-এ অস্ত্র বর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা, নিজেদের প্রতাপ বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-সম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সবচেয়ে বেশী। **কিন্তু 'লীগ অব নেশনস'-এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ বন্ধ করতে চায়না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে।** (বড় হরফ লেখকের) এই জন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্র-শস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে।"(২০)

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে জাতিসংঘের পুতুল নাচের ভূমিকা রাবীন্দ্রিক অভিযোগের সাতচল্লিশ বছর পরেও কি এতটুকু পরিবর্তনের দিকে গেছে? অন্ততঃ আফ্রো-এশিয়ার ক্ষেত্রে তো নয়ই। জাতিসংঘ ও সাম্রাজ্যবাদী কূট চক্রের আঁতাত আজো ঠিক তেমনি রয়ে গেছে। এই নির্মম উন্মোচনে বিশ্বশান্তি ও গণমানুষের অনুকূলে একজন সৎ শিল্পীর ভূমিকাই প্রতিফলিত হয়েছে। অথচ আমাদের কবি নিশ্চয়ই জানতেন যে পশ্চিমী দুনিয়ায় তাঁর এই অপ্রিয় সত্যভাষণ সাদরে গৃহিত হবেনা। এবং তা যে হয়নি 'মডার্ণ রিভিয়ু'-তে এসব চিঠির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞাই তার প্রমাণ।

মার্কসবাদী তত্ত্বের কোন কোন দিক সম্পর্কে, বিশেষ করে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক এবং একনায়কত্ব ও জবরদস্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের যে সংশয় ছিল, একথা সুপরিচিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ব্যক্তিকতাকে উপেক্ষা করে যে সামগ্রিক ও সমষ্টিগত সাধনার কর্মকাণ্ড সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চলতে থাকে, তার সামগ্রিকতা ও সততা কবির অন্তর স্পর্শ করে ছিল। রবীন্দ্রনাথ একে শুধু স্বীকার করেই ক্ষান্ত হননি ; উল্লসিত হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন এর মহতী রূপ দেখে। অথচ পৃথিবীর কোনো দেশেই এমন কি জাপানের গড়ে ওঠার উদ্যমেও কবি আনন্দিত অভিনন্দন জানাননি দু-হাত তুলে। কারণ, কবির জানতে বাকী ছিলো না জাপানী অগ্রগতির অন্তর্নিহিত রূপ ঃ

> "অন্যান্য যেসব দেশ ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয়না, তাদের নানাকর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তি স্বরূপ ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।
>
> "যেসব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব।
>
> "ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়।"(২১)

রবীন্দ্রনাথের মতে রাশিয়ার সমাজবাদী অর্থনীতি সেই ব্যক্তিক লোভের পথ একেবারে বন্ধ করে দিতে পেরেছে। ব্যক্তিগত মুনাফার পথ বন্ধ হওয়ায় সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতির সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। অথচ

> "য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে, ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন—আলোড়ন খুব প্রচণ্ড। মানব প্রকৃতির মধ্যে লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। কিন্তু সোভিয়েটরা বলতে চায় মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া।"(২১)

ধন-বৈষম্যের প্রশ্ন তুলে আদর্শগত লড়াই-এর দিক থেকে রাশিয়া ও পশ্চিমী দেশের অর্থনৈতিক ও আদর্শগত প্রভেদ নির্বিবাদে তুলে ধরলেন কবি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের একক অথচ মহতী ভূমিকা কবি-চিত্তে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে দিলো ঃ

> "রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখিনি। সম্মিলিত শিক্ষার যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্ব সাধারণের কাজে সফল করতে চায়। **এরা বিশ্বকর্মা, অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই।** অতএব এদের জন্যই যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়।"(২১)

এতকাল পরে যেন অভিষ্টকে পাওয়া গেলো, পাওয়া গেলো সেই সোনার হরিণটিকে। কিন্তু তাকে আপন ভুবনে নিয়ে যাবার পথে বাধা-বিপত্তি যে প্রচুর। তবু চেষ্টার ত্রুটি ছিলোনা কবি-মানসের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের মূলতত্ত্ব সমষ্টিকেন্দ্রিকতা, ধনের সাম্য, বিপুল কৃষি-সমবায়ের যজ্ঞ রবীন্দ্র-চেতনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ব্যবহারিক তত্ত্ব হিসাবে এ যেন কবি মনের অনুকূল, যদিও একনায়কত্বের দিকটা সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে,

আপৎকালের প্রয়োজন হিসাবেই শুধু মেনে নেওয়া চলে, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে নয়—আর এখানেই পুনর্বার সেই আন্তর-দ্বন্দ্ব।

ললিতকলা যে কোনো প্রকার কঠিন সংকল্প তথা শক্তি সাধনার বিরোধী নয়, এই সত্য তিনি রাশিয়ার বাস্তব অবস্থা দেখেশুনেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক তরফা রসের কারবারি কিংবা এককভাবে শুধুমাত্র শক্তি-সাধনার পথিক হবার বদলে দুই স্রোতের সামঞ্জস্যেই যে জীবন সমৃদ্ধ রূপ গ্রহণ করতে পারে এই বিশেষ সত্যের সমর্থন পেয়েছিলেন সেখানে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব তথা রসতত্ত্ব যে উপযুক্ত পরিবেশে জীবন বাস্তবতার ফসল ফলাতে পারে, বায়বীয় কোন লক্ষ্যের উদ্দেশে আকাশচারী নয়, শিল্পের গণমুখী রূপের প্রশংসায় উচ্চকিত রাবীন্দ্রিক বক্তব্যাদি তার যথাযথ প্রমাণ তুলে ধরে :

> “১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যেসব দর্শক গ্যালারিতে আসত তার ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দরজি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়।
>
> “এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যেসব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায়, তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্য এত প্রভূত আয়োজন। রাশিয়ায় নবনাট্য কলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোন বিরোধ ঘটেনি।”(২১)

শিল্পকে বিশুদ্ধ রসভোগেই নয় শুধু, তাকে গণ-প্রয়োজনের তথা জীবনের অঙ্গীভূত করার মধ্যে কোন অসংগতি দেখেননি কবি ; তাঁকে বলতে হয়নি যে এসব প্রচেষ্টা পদ্মবনে মত্ত হস্তির আনাগোনা, বরং অভিনন্দন জানালেন কর্মের সাথে শিল্পকলার মহতী মিলন ও সংগতি সাধনাকে। এর অর্থ প্রাচীন মূল্যবোধকে শিল্পকলার অঙ্গন থেকে বিদায় দেওয়া, নতুনকে স্বাগত জানানো এবং সমাজবিপ্লবকে শত্রু বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়। অকুণ্ঠিতচিত্তে রাশিয়ার নবশিল্পকলায় গণমানসের ভূমিকাকে জানিয়েছেন সম্বর্ধনা :

> “রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলা সাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নতুন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামেনি। ওখানকার

> সমাজবিপ্লবে এই নতুন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করেনি।"(২১)

শুধু শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি রবীন্দ্রনাথ। আপন অন্তরে তুলে নিলেন শিল্পকলা সংক্রান্ত এদের মতাদর্শ। তাই গভীর বিশ্বাসে ভর করে বলে উঠলেন :

> "রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানা ঘরে সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তাহলেই বুঝতুম, এরা শুকিয়ে মরবে। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদেরও সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিশের যষ্টি-ধারার শ্রাবণ-বর্ষণেও আমার নাচ-গান বন্ধ হবেনা।"(২১)

এরপর এ অভিযোগ নিতান্তই হাস্যকর শোনাবে যে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র বিশুদ্ধ রসের কারবারী। বরং দেখা যাচ্ছে যে শিল্পকলায় গণমানসের উপস্থিতি ও ভূমিকা তাঁর কাছে জীবন-যাপনের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। বেঁচে থাকলে এদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরে গণনাট্যের বলিষ্ঠ ভূমিকার সাথে আপন প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করেই বরং শিল্পীর কর্তব্য সমাপন করতেন বলে মনে হয়। শিল্পের এই গণমুখী ভূমিকার সমাদর তাঁকে মহান শিল্পীদের সাথে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। রঁল্যা, টলস্টয়ের প্রগতিশীল ভূমিকার সাথে কোন তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়না এই বাঙালী কবির গণমুখী ভূমিকার।

কলাতত্ত্বে সোভিয়েট জনগণের ভূমিকার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের সাধুবাদ জানিয়েছেন এই বলে যে, 'মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে রেখেছিলো যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র ও পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র সোভিয়েট বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে।" শুধু তাই নয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দস্যুবৃত্তির সাথে তুলনা করে বিপ্লবের বিপুল ওলট-পালটের মধ্যেও স্বদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন সোভিয়েট বিপ্লবীদের প্রতি। কারণ এগুলো বিশ্বমানবের চিরকালের সম্পদ :

> "মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্ত প্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহুযুগের অমূল্য শিল্প সামগ্রী কিরকম লুটে পুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে

> উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিষ আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না।"(২২)

কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত ঃ "ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দলবেঁধে যা কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিষ সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে রক্ষা করতে লাগল।"(২২) অথচ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে সবাই যে আহারে-বিহারে কষ্ট পেয়েছে, নন্দনতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের মত সে বিষয়ে সোভিয়েটের সমালোচনা না করে বরং সেই কঠিন বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ "এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলবো না, সে যে তপস্যা।" এই সুকঠিন আদর্শবাদ থেকে কি আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নেই ?

রাশিয়ায় দেশব্যাপী গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মহিমায় রবীন্দ্রনাথ এমনি অভিভূত হয়েছিলেন যে স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছিলো। তার মন বলছিলো ঃ হবে, হবে, এই পথেই হবে। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লব ছাড়া শুধুমাত্র সংস্কারের পথে এমন অসাধ্য-সাধন যে সম্ভব নয়, এই রাজনৈতিক সত্য বুঝতে গিয়ে যেন আরেক সংশয় ও সংকটের সম্মুখীন হলেন কবি। একদিকে রয়েছে আজন্ম লালিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মোটা মোটা শিকড়, যেগুলো ওপড়ে ফেলতে গেলে অস্তিত্বের উপর টান পড়ে, অন্যদিকে চোখের সামনে বিরাট মাটির পাত্রে জ্বলজ্বল করছে অসাধ্যসাধনের ছাইমাখা আগুন, যা দেখে অন্তর মুগ্ধ, সত্তা বিচলিত। অথচ এই বিপুল সাধনার সমান্তরাল-যান্ত্রিক নয় প্রচলিত বোধ, গণতান্ত্রিক মানবতাবাদ কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ শান্তিবাদী ভাবনা-চিন্তা। এই দ্বিধা আর সংশয় তাকে সংকটাপন্ন করে তুলে ছিলো, যার ফলে সর্বহারার একনায়কত্বের স্বপক্ষে পরিপূর্ণ চেতনার শেষ রায় উচ্চারণে বাঁধা পড়ছিলো। তাঁকে বারবার প্রলুব্ধ করছিলো মধ্যপথ অনুসরণের তত্ত্ব, যে জন্য মানবপ্রকৃতি ও মানবসম্পর্ক তাঁর বিচার বিশ্লেষণের প্রধান উপকরণরূপে জেগে রইলো। এর আত্যন্তিক্ উপলব্ধি এই তত্ত্বই তুলে ধরতে চাইলো যে ধনগত অসাম্য দূর হোক, যুগান্তরের পথ বানানোয় পুরনো বিধি-বিশ্বাসের শিকড়গুলো ওপড়ে ফেলা হোক, কিন্তু তার ক্রমপরিণতি ও স্থায়িত্ব আসুক মানব প্রকৃতিকে মেনে নিয়ে, ক্রমবিবর্তনের পথে।

পশ্চিমী গণতান্ত্রিকতার অন্ধ ভক্তদের মতো সমাজতন্ত্রের প্রতি অন্ধ-বিতৃষ্ণার শিকার হননি বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে "ডিক্টেটরশিপ মস্ত আপদ" বা 'প্রয়োগের মাধ্যমে মার্কসীয় অর্থনীতির তত্ত্বগত অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন হতে পারে' ইত্যাদি প্রশ্নবোধক বক্তব্য রেখেও দ্বিধা করেননি সমাজতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের অসাধ্যসাধনের পক্ষে সমর্থন জোগাতে। 'ওরা একহিসাবে ফ্যাসিষ্টদের মতো। কারণ সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোন বাধাই মানতে চায়না'(২৩) : এইসব প্রশ্ন তুলে ধরে আবার নিজেই এর জবাবে যুক্তি খাড়া করেছেন এই বলে যে, 'এরা সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা, চর্চার দ্বারা ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিষ্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করেনি। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথাযথই দৌরাত্ম্য করতে চায়, তারা মানুষের মনকে মারে আগে ; এরা মনের জীবনী শক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।'(২৩)

নব্য রাশিয়ার সাথে জার-শাসনের গুণগত প্রভেদ যেমন তুলে ধরলেন কবি, তেমনি প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে যে আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থাবলী নিতে হচ্ছে বাধ্যবাধকতার দায়ে, এ সত্যও তুলে ধরতে দ্বিধা করলেন না। রাশিয়ার অভিনব কর্মযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই সৎ-প্রয়োজনের তাগিদে একনায়কত্বকেও বুঝি সাময়িক পন্থা হিসাবে মেনে নেওয়া চলে :

> "রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয়নি—একদা যে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত করে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে।"(২৪)

আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক কবির নজরে পড়েছিলো, তা হলো রাশিয়ার ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থ-লোভের একান্ত অনুপস্থিতি। তাঁর অনুভবে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থান পেয়েছিলো যে "রাশিয়ার জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।" সম্ভবতঃ এ কারণেই সেখানকার রাষ্ট্রনায়কদের আপাত-

কাজ উদ্ধারের নীতিতে আপত্তিকর কিছু দেখতে পাননি কবি :

> “রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা। অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্য চারিদিকে ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণ কার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বল প্রয়োগ করতে ওদের দ্বিধা নেই।”(২৪)

তবু বলপ্রয়োগের স্বপক্ষে যুক্তিজাল কবি-কণ্ঠে যেন সবল দৃঢ়তা নিয়ে ফুটে উঠেনি। এর কারণ খুঁজতে গেলে আবার আমরা সেই বহু-কথিত উৎস-বিন্দুটিতে পৌঁছে যাই, যেখানে শিল্পী-মানসের অন্তর্বিরোধ বা সংকটের আভাস আলোছায়ায় প্রতিফলিত।

উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা বা অন্তর্বিরোধটুকু অস্তিত্বে বহন করেই এগিয়ে গেছেন এই কালজয়ী শিল্পী। জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে গুণগত অর্থে এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিলোনা। সীমাবদ্ধতার প্রশ্নে আরেকটি সংশ্লিষ্ট তথ্য স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে আসে যে, রবীন্দ্রনাথের সমকালে রাজনৈতিক উপকরণের সংঘবদ্ধতা ও গতি যেমন ছিলো জাতীয়তাবাদের উগ্রশীর্ষের দিকে, তেমনি শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাথমিক উপকরণগুলো তখনো সুসংহত হতে শুরু করেনি; এমনি এক নৈরাজ্যিক পর্যায়ে বয়োবৃদ্ধ কবিকে প্রগতিশীলতার দায়ে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক হতে হবে, এমন তত্ত্ব নিঃসন্দেহে কাল্পনিক ইচ্ছা পূরণের সূত্রই প্রতিফলিত করে থাকে, বাস্তবোচিত কোন ধ্যান-ধারণা নয়। প্রসঙ্গতঃ আমরা জানি যে, সমাজে শ্রেণী-চেতনার প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে কিংবা জনতার সংগ্রামী চেতনার প্রকাশ ও বিকাশের ধারায় অনেকটা সমান্তরাল-ভাবেই সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংগ্রামীধারার বিকাশ ঘটতে থাকে, এবং সে বিকাশ সমাজ-বাস্তবতার মূল সূত্র অনুযায়ী ঘটে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপর্বের অব্যবহিত পূর্বে এবং সমকালে বাংলাসাহিত্যে দুই বিপরিত স্রোতের উপস্থিতি সক্রিয় ছিলো, এবং সেক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার স্রোতটিই ছিলো বলিষ্ঠতর। এই শেষোক্ত ধারাটি একদিকে যেমন দেশের রাজনৈতিক চরিত্রে প্রভাব ফেলেছে, তেমনি আবার পুষ্টি আহরণ করেছে রাজনৈতিক কক্ষের পশ্চাদগতি ও ভক্তিবাদী প্লাবনের পলি থেকে।

এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পেলাম যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিলো, বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহ-

অবস্থান, পারস্পরিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের সুসংহতিকরণ, এবং সর্বোপরি শক্তিমানের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির সুনিশ্চিত অঙ্গীকারে এক বলিষ্ঠ বিশ্বজাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা। এজন্যই যুদ্ধের বিরোধিতায় এবং বিশ্বে স্থায়ী শান্তি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে সোচ্চার এবং সংকল্প-কঠিন দেখতে পাই। কিন্তু কবির তথা বিশ্বমানবের দুর্ভাগ্য যে, বিশ্বজাতীয়তার আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়া দূরে থাক, বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই আজ সবচেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বিশ্বের শক্তিমান দেশগুলোর স্বার্থ-সংকুল প্রতিবন্ধকতা আজো এমনি তীব্রতায় সক্রিয় যে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ এক বিপজ্জনক আঘাতের সম্মুখীন।

রবীন্দ্রনাথের কাল নির্বিষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছে সমাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের অন্তর্লীন সংঘাত। এ সংঘাত সময়ের সাথে সাথে আরো তীব্র হয়ে উঠেছিলো, প্রভাব বিস্তার করেছিলো বিশ্বজুড়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মানস-গভীরে, দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়েছিলো তাদের। উগ্রজাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সজোরে প্রত্যাখ্যান করলেও গণতান্ত্রিকতার মসৃণ পথের জন্য বোধকরি তাঁর অন্তরে সঞ্চিত ছিলো সুনিশ্চিত মোহ। কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, গণতান্ত্রিকতার পতাকাতলে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন বা শোষণের সাথে রবীন্দ্রনাথ কখনোই আপোষ করেন নি, বরং এ বিষয়ে তিনি সর্বদাই ছিলেন তীব্রকণ্ঠঃ

> “আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্যাতন উপলক্ষে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রের সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে বিপুল অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়।...আর গলদের কথা যদি বল, সেই আয়ারলণ্ড-আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ ও ডার্ডানেলিস-মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ দেওয়া যায়।”(২৫)

আসলে যে সমাজ-নির্ভর উদার গণতান্ত্রিকতার আদর্শ ছিলো কবির পরম আকাঙ্ক্ষিত, শ্রেণীবৈষম্য ও ধনবৈষম্যসংকুল সমাজে তাঁর পরিচয় যেমন ইউটোপিয়ান, তেমনি তার অধিবাস বাস্তবের চেনা মহলে নয়, বরঞ্চ স্বপ্নের সাতমহলা পুরিতে। স্বভাবতঃই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও আঘাত বার বার তাকে নিক্ষেপ করেছে হতাশায় কিংবা সংকটে। কিন্তু প্রকৃতিগত প্রাণময়তার দরুণ নিজেকে ক্ষয় করেও স্থির থাকতে চেয়েছেন কবি, স্তব্ধ বা নিশ্চল

হয়ে পড়েন নি। বরং নতুন উদ্যমে এগিয়ে গেছেন সমাধানের অন্বেষায়। আর এখানেই রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মূলধন করেই দুরূহ ধাপ অতিক্রম করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কখনো নিজেকে অভিযোজিত করেছেন আদর্শগত প্রশ্নে, কখনোবা নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।

তাই দেখতে পাই, রবীন্দ্রমানসে আন্তর্জাতিক চেতনার কার্যকরী প্রকাশ সামগ্রিকভাবে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী ও দেশ-কাল নির্বিশেষে মানব-কল্যাণের, যুদ্ধবাজ-ফ্যাসিবিরোধী শান্তিবাদের এবং সাধারণভাবে এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাদী শিবিরের স্বপক্ষে। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতার বা সাম্রাজ্যবাদী-শোষণের হাত শক্তিশালী করার ভ্রান্ত পথে পা বাড়ান নি, যা প্রায়শঃই গণতান্ত্রিক শিবিরের বা বিশুদ্ধ শিল্পের সমর্থক সাহিত্যিকদের বেলায় লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক-চেতনা এই বিশেষ অর্থে অনন্য।

তথ্য-নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জলস্থল', রচনাবলী-২৬শ (১৩৫৫) : ৪৮০
২. ঐ 'যাত্রা', ঐ : ৪৯১
৩. ঐ 'চিঠিপত্র', রচনাবলী-২য় (১৩৪৬) : ৫২৯
৪. বাগদাদে সম্বর্ধনা উপলক্ষে কবির বক্তৃতা, বিচিত্রা (চৈত্র, ১৩৩৯) : ৩০২-৩০৭
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পারস্যে-২', রচনাবলী ২২শ (১৩৫৩) : ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৫
৬. ঐ 'পারস্যে-১০', ঐ : ৪৯৪
৭. ঐ 'পারস্যে-৮' ঐ : ৪৮৬
৮. ঐ 'জাপানযাত্রী-১৫' রচনাবলী-১৯শ (১৩৫২) : ৩৫৮
৯. ঐ 'কালান্তর', রচনাবলী-২৪ (১৩৫৪) : ২৫১, ২৫২. ২৫০
১০. ঐ 'বুদ্ধভক্তি' ঐ : ১১
১১. ঐ 'লড়াইয়ের মূল', ঐ : ২৭২
১২. ঐ 'শূদ্রধর্ম', ঐ : ৩৬৬, ৩৬৬-৩৬৭
১৩ ঐ 'ব্যবস্থা ও অব্যবস্থা', রচনাবলী-৩য় (১৩৬৩) : ৬০২
১৪. যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহর থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (বৈশাখ,' ১৩২০)
১৫. যুক্তরাষ্ট্রের লস্-এঞ্জেলস থেকে শান্তিনিকেতনে লিখিত চিঠি, অক্টোবর, ১৯১৬, (চিঠিপত্র-২)

১৬. বিশ্বভারতী'র প্রথম পরিষদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতি রূপে ১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, 'বিশ্বভারতী বক্তৃতামালার পরিশিষ্ট,' রবীন্দ্ররচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ৪২৪-৪২৫

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বভারতী বক্তৃতামালা-৭', ঐ : ৩৭৩

১৮. ঐ 'বিশ্বভারতী বক্তৃতামালা-১০', ঐ : ৩৮২-৩৮৩

১৯. ঐ 'রাশিয়ার চিঠি-৩', রচনাবলী (১৩৫২) : ২৮১, ২৭৯, ২৭৯

২০. ঐ 'রাশিয়ার চিঠি-৪', ঐ : ২৮৬, ২৮৭

২১. ঐ 'রাশিয়ার চিঠি-৭', ঐ : ৩০৪, ৩০৪-৩০৫, ৩০৫, ৩০৬-৩০৭, ৩০৮

২২. ঐ 'রাশিয়ার, চিঠি-৯', ঐ : ৩১৩

২৩. ঐ 'রাশিয়ার চিঠি-১৩', ঐ : ৩২৮

২৪. ঐ 'উপসংহার : রাশিয়ার চিঠি', ঐ : ৩৪২, ৩৪৩

২৫ ঐ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', রচনাবলী-১৮ (১৩৫১) : ৫৪৭

রবীন্দ্র-মানস ঃ পর্বান্তরে

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবয়ব প্রধানতঃ কবিতায় গানে নাটকে উপন্যাসে গল্পে প্রবন্ধে চিঠিপত্রে ও ব্যক্তিগত নিবন্ধের ব্যাপক পরিসরে মূর্ত। এইসব শিল্প সৃষ্টির উৎসমুখে যে মানসিকতা বা চেতনা মূল ধারা বা চরিত্র রূপে সজীব, তার বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে বিশ্বমানবের কল্যাণ ; মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা অত্যাচার-অবমাননা দারিদ্র ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে উদ্বেল আকুলতায় (কখনো উচ্চকণ্ঠে, কখনোবা হার্দকণ্ঠের সংযত-দৃঢ় ভাষণে) রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এই মানবিক চেতনা স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে বিভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র। অর্থাৎ রৈবিক মানবিকতার অভিব্যক্তি কখনো ধনতান্ত্রিক অসাম্যের বিরোধিতায়, কখনো গভীর স্বাদেশিকতায়, কখনো বা সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিশ্বশান্তির আহ্বানে, আবার কখনো ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে কিংবা সামাজিক রক্ষণশীলতা ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অথবা সত্য-ন্যায়-কল্যাণের ভিত্তিতে বিশ্বজনীনতার নিশ্চিত আশ্বাসে অগ্রসর। বিশেষ কোন মতবাদের কক্ষে প্রবেশের অনিচ্ছা নিয়েই কবির এই পথ-পরিক্রমা নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আলোকে সক্রিয় ছিলো।

গভীর অবধানে দেখা যায় যে তারুণ্যের সৃষ্টিশীল পর্যায় থেকেই কবি এই বিশিষ্ট মানসিকতার হাত ধরে অগ্রসর। এবং সেই তারুণ্যের প্রাণোচ্ছলতায় উচ্চারিত বোধ—“হয় বাঁচিব নয় মরিব ; এই কথাই ভালো” জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিলো। ১৮৬১ সালে যার জন্ম সেই কবি যদি পর্বান্তরে নিজকে নতুন করে, বিচিত্রতর রূপে সৃষ্টি করতে না পারতেন, তাহলে এ যুগে আমরা তাঁকে নির্বিবাদে ‘ভাববাদের’ ইতিহাস-সিদ্ধ কক্ষে নির্বাসিত করতে পারতাম। কিন্তু সৌন্দর্য স্পৃহা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব

চর্চার পাশাপাশি কিংবা ভক্তিমূলক গানের আকুল নিবেদনের সমান্তরাল মানবিকতার বলিষ্ঠ ও বাস্তব ঘোষণায় তাঁর সৃষ্টিশীলতা দেশ-কাল ও অবস্থা বিচারে গুণ-সমৃদ্ধ অভিনব মাত্রার সংযোজনা ঘটিয়ে উল্লিখিত ভয়াবহতার সাগর-পাড়ি দিতে সমর্থ হয়েছে।

১২৯৩ সালে প্রকাশিত ‘কড়ি ও কোমল’ (রচনাকাল ১২৯৩ সালেরও কিছু পূর্বে) গ্রন্থে তরুণ কবির স্বাদেশিকতায় উদার মানবিক আকাশের ছায়া পড়েছে। বিত্তহীন মানবতার স্বপক্ষে ক্ষুব্ধ রাবীন্দ্রিক অভিব্যক্তি “দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লানমুখ বিষাদে বিরস” ইত্যাদি অনেকেরই অজানা নয়। এমন কি ক্ষুদ্র ফুলের এবং তার সৌরভের ক্যানভাসে ফুটে উঠে “স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস” এবং “বৃহৎ আকাশ।” সেই প্রথম পর্যায়ে রোমান্টিকতার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের রাজ্যে বিচরণ করতে গিয়েও কবি এই বাস্তববোধের স্পর্শ অনুভব না করে পারেন না যে “স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।” আর সেই স্বাপ্নিকতার উদ্যান থেকে বেরিয়ে আসার পথ-নির্দেশ হলো :

“চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে
সুখদুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে।”
(কড়ি ও কোমল)

প্রেমের পথযাত্রায় স্বপ্ন নয়—“বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে”। গজ-মোতির্মিনারে কুসুমশয়নে অধিবাস সম্ভব হলোনা বলেই পাশাপাশি মাটির বাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া গেল। অন্যদিকে সৌন্দর্য-পিপাসু অতীন্দ্রিয় প্রেম নয়, প্রেমের দেহ-ঘনিষ্ঠ রূপ ফুটে উঠল অধরের পিপাসায় এবং প্রতি অঙ্গ তরে প্রতি-অঙ্গের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায়। বাংলা কবিতা এই তরুণ কবির হাতে আঠারো’শ সালের আশির দশকে বাস্তবতার তথা জীবন-বাস্তবতার পাঠ গ্রহণ করলো। কবির আদর্শ ও সাধনা শুধুমাত্র অর্থহীন শব্দ-পংক্তি বা স্তবক নির্মাণ নয়, ‘খাঁচার পাখীর মতো গান গেয়ে মরা নয়’ :

“প্রাণে ম’রে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়!
কে আছ মলিন হেথা কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান—” (কড়ি ও কোমল)

আজ থেকে নব্বই বছর আগে আধুনিক বাংলা কবিতার অতি প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ মালার্মে-কথিত বিশুদ্ধ কবিতার সংজ্ঞা দূরে ফেলে দিয়ে

কবিতার প্রয়োজন-নির্ভর তাৎক্ষণিক রূপের প্রতিষ্ঠা করলেন প্রধানতঃ মাটির মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে, এবং স্বাদেশিকতার ভাষ্যে বিশ্বমানবের কল্যাণে তাকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়ে। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি যেমন 'বঙ্গভূমির প্রতি' 'বঙ্গবাসীর প্রতি' 'আহ্বান গীত' প্রভৃতি কবিতায় স্বাদেশিকতার প্রকাশ ঘটালেন বঙ্গ সাগরের তীরে, তেমনি আবার শতকোটি বিশ্বমানবের ভাষা মূর্ত করে তুলতে চাইলেন স্বদেশী ভাষায়, স্বদেশী গানে :

"চলো জন কোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানব হৃদয়ে
অসীম আকাশ তলে।" (কড়ি ও কোমল)

কাব্য জীবনের শুরুতেই কবি এই যে বিশ্বজনীনতা তথা আন্তর্জাতিকতার পাঠ গ্রহণ করলেন, সময়ের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে তা ব্যঞ্জনাগর্ভ গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের এই প্রাথমিক বিকাশ শুধুমাত্র শরীরি-প্রেমের ঘনিষ্ঠতায়ই সীমাবদ্ধ রইলোনা, যৌবনের প্রাণ-চঞ্চল সতেজ উদ্দামতায় জীবন-যাপনের প্রচণ্ড অভিলাষ তীব্র গতিছন্দে অভিব্যক্তি লাভ করলো (দুরন্ত আশা-১৮৮৬ : মানসী)। এই তীব্র গতিময়তার অশ্বে সওয়ার হয়ে কবি 'দাস্য-সুখে হাস্যমুখ' বাঙালীর বিনম্র দীনতাকে প্রবল কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। কারণ বাঙালীর ক্লীব করণিক বৃত্তি এবং বিদেশী প্রভুর প্রতি দাস-মনোভাব রবীন্দ্র-মানসে অসহ্য জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। যৌবনের এই দুর্দম আকাঙ্ক্ষাই কবিকে বিশ্ববীক্ষায় আরো গভীরভাবে দীক্ষা নিতে সাহায্য করেছিলো, যার ফলে মুছে গিয়েছিলো মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের প্রশ্ন, শুচি-অশুচির প্রশ্ন ; এমন এক ভুবন তাঁকে ক্রমাগত ডাক পাঠাচ্ছিলো যেখানে "নাহি কোনো ধর্মাধর্ম নাহি কোনো প্রথা"। এমনি মুক্ত প্রাণ আহ্বানে বাধাবন্ধহীন গতির সারল্য প্রথাসিদ্ধ পথে চলতে চায়না, আর চায়না বলেই 'আরব-বেদুয়িনের' সুতীব্র জীবন ছন্দের আকর্ষণ উপেক্ষা করা যায়না। সে আকর্ষণ শুধু রক্তে নয়, চেতনার গভীরতম প্রদেশে দীর্ঘস্থায়ী আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর সেজন্যই কি দীর্ঘকাল পর সত্তর বছর বয়সেও আরব-দুনিয়া ভ্রমণ-রত কবি বৈচিত্র্যময় বেদুয়িন-জীবনের তীব্রতা অন্তরে অনুভব করেন, বিশেষতঃ যখন দেহ জীর্ণ, রক্তে নিস্তেজ জরার প্রভাব। আরো বিস্ময়কর যে, এই জরাহত অবস্থায়ও রবীন্দ্রনাথ

কোন আধুনিক কবির মৃত্যুচারিতার বা পশ্চাদগতির মোহকরী বৈনাশিকতার শিকার হননি। জীবন তাঁর কাছে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রস-সমৃদ্ধ উপভোগের বস্তু রূপে চিহ্নিত ছিলো, আর ছিলো রূপরস বর্ণগন্ধময় পৃথিবীর জন্য তার অসীম ভালোবাসা।

এরপর প্রেমের বিচিত্র লীলা, নরনারীর জটিল সম্পর্ক, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য-বোধ প্রভৃতি নানান বিষয়ে অজস্র সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে বার বার ধুলোকাদা-মাখা মাটিতে পদচারণা করেছেন কবি, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন মানুষের অপমান-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। জীবনের ধুলোমাখা ঘরোয়া ছবি বার বার তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ১৩০০ সালে লেখা 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার প্রধান উপজীব্য বিশুদ্ধ প্রেম নয়, বরং সেখানে ছিলো "কেরানী জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা" যা বন্ধু লোকেন পালিতের ধিক্কারে সংশোধন করেছিলেন কবি, যদিও এর জন্য একটি কাঁটা বরাবর তাঁর মনে খঁচ খঁচ করে আপন অস্তিত্ব জানান দিয়ে যাচ্ছিল। সেই একই বছরে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় শুধু যে আগুনের ঝলসানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো তাই নয়, সেখানে দেখা গেল পূর্বোক্ত ভ্রান্তিক্ষয়ের আন্তরিকতা। তাই চোখে পড়ে ঃ

> "স্ফীতকায় অপমান
> অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
> লক্ষ মুখ দিয়া।" (চিত্রা)

প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে সেকালে উপমহাদেশে শ্রেণী-চেতনার বিকাশ দূরে থাকুক, জাতীয় চেতনার প্রকাশও ছিলো অত্যন্ত নীচু স্তরে। তবু এই কবির কণ্ঠে আমরা পেলাম অন্য এক চেতনার ধ্বনি, যা ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে সাহস ও আত্মশক্তির অভিব্যক্তি ঘটায়।

এই সাহস ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরতার বোধে নিশ্চিত ছিলেন বলেই কী ব্যক্তিক চেতনায়, কী জাতীয় চেতনায় শক্তির আবাহনে আত্মোপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ

> "দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ প্রবল আবেগে আপনাকে উপলব্ধি করতে চায়।"(১)

উপলব্ধির গভীরতা পারস্পরিক সম্পর্কে গড়ে তোলে স্বচ্ছতা ; অধিকার লুণ্ঠন কিংবা লোভের সীমানা সঙ্কুচিত করে ফেলে। জাতীয়-চেতনার

সাথে এজন্যই চাই আত্মোপলব্ধির গভীরতা এবং আত্মশক্তির সংহত প্রকাশ। এই বিশেষ আদর্শে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ জারিত ছিলো বলেই ১৯০০ সালেও কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তার দস্যুবৃত্তি এবং সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের লোভ কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। 'নৈবেদ্য'র বিনম্র ভক্তি-চেতনার পাশাপাশি তাই বেজে উঠেছে বলিষ্ঠ পরুষ কণ্ঠের তীব্রতা, প্রধানতঃ দস্যুজাতীয়তার সম্প্রসারণবাদী লোভের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদী কবিকুলের মানব-বিরোধী চেহারার প্রতি ধিক্কারে ঃ

(ক) "শক্তিদম্ভ স্বার্থলোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।" (নৈবেদ্য)

(খ) "শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে
অস্ত গেল ; হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ-রাগিণী...
"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত ; লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে।...
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

"কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।" (নৈবেদ্য)

এমন কঠোর কাব্যিক ধিক্কার এবং এমন রূঢ়তায় ফ্যাসিস্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের মুখোশ উন্মোচন আজ থেকে ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বে এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিলো ; দ্বিতীয় কোন ভারতীয় কবির কণ্ঠে সেকালে উচ্চারিত হয়নি উগ্রজাতীয়তাবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এমন প্রদীপ্ত ঘৃণার ঝলসানি। এমন কি এদের বীভৎসতার রূপচিত্র এঁকেও কবি নিশ্চিত ছিলেন এদের সর্বশেষ পরিণাম সম্পর্কে ঃ

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।...
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়।

"ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।" (নৈবেদ্য)

অকস্মাৎ কবির এই রূঢ় কাঠিন্যের পেছনে কি ছিলো সেসময়ের তাৎপর্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক একটি পরিস্থিতি? দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বোয়ার যুদ্ধে' শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতাই নয় শুধু, চীনে বক্সার যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী পঞ্চশক্তি (ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানী-রাশিয়া-জাপান) কর্তৃক মিলিত অভিযানের বীভৎসতা কি কবির মনে রক্তাভ ছায়া ফেলেনি? তার প্রবন্ধাবলীতে এই দুই যুদ্ধের বর্বরতার একাধিক উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে এক্ষেত্রে "দারুণ সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি" লক্ষ্য করেও কবি সংগ্রামের আহ্বান জানাতে দ্বিধা করেছেন; শক্তি ও ভরসা খুঁজেছেন বিশ্ব-ধাতার পরম শক্তির কাছে, যার আসন থেকে হয়তো অত্যাচারীর মাথার পরে নেমে আসবে 'রুদ্র বাজ'। তবু শেষ পর্যন্ত কবির সততা এই ভাববাদী সান্ত্বনায় তাকে তৃপ্ত থাকতে দেয়নি। বিধাতার ছককাটা কর্তব্যের পথ ধরেই কবি অনুভব করেনঃ ক্ষমা নয় এই আগ্রাসী শক্তিকে, অন্যায়ের নির্বাক নিষ্ক্রিয়তা অপরাধ, বরং নিষ্ঠুর হবার সংকল্পেই সেখানে সততার প্রকাশঃ

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গ সম...
"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।" (নৈবেদ্য)

এই শৈল্পিক সততাই রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য এবং সীমিত অর্থে তাঁর সংগ্রামী-মানসিকতার প্রতীক। এবং এ'কে রাবীন্দ্রিক চেতনার আলোকেই বিচার করতে হবে।

আমরা অনেকেই ভুলে যাই জীবনভর রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া সচ্ছলতার ঔদার্যে জীবনযাপন করেও কী পরিমাণ বাধা বিপত্তি নিন্দা ও প্রতিকূলতার জোয়ার ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়েছে, যেহেতু তাঁর প্রতিপাদ্য বক্তব্য ছিলো সমকাল থেকে অগ্রবর্তীকালের। কবিতায়, প্রবন্ধে, নাটকে উপন্যাসে সর্বত্র ছিলো এই বিরোধিতার ও প্রতিকূলতার প্রবল আঘাত। শুধু অচলায়তন ও সমসাময়িক রচনাই নয়; 'ঘরে বাইরে' কিংবা 'দুইবোন'-এর মতো উপন্যাসের জন্যও তাঁকে রক্ষণশীল সমাজের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয়েছে অবিরাম আঘাত। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই; অথচ বিশদ বিশ্লেষণে এখনো প্রতীয়মান যে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর কিছু কিছু বক্তব্য ছিলো বাস্তব-নির্ভর, বিচার-বিশ্লেষণ ছিলো সঠিক। উপনিবেশ

ভারতে ইংরাজের গণবিরোধী ভূমিকার প্রায় সব ক'টিতেই সোচ্চার ছিলো রাবীন্দ্রিক প্রতিবাদ। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, জাপান-জার্মানির ভূমিকার প্রতিবাদে প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে অজস্র রচনায়, প্রভূত কর্মে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের পক্ষে। ভাববাদের অন্ধকার গুহা থেকে এই ভূমিকা গ্রহণ কি সম্ভব ?

বন্ধ জলাশয়ের বা সংস্কারের জড়তা থেকে মুক্তিকামী কবি তারুণ্যের কাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছেন। বিশ শতকের গোড়াতেও যখন তাঁর কাব্যে প্রকৃতি-চেতনা কিংবা অস্পষ্টতার আলো-আঁধারির খেলা, তখনও পাশাপাশি বাঁধনহারা যৌবনের ডাক, সবুজ তারুণ্যের শক্তিকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের কঠিন পথে নেমে আসার আহ্বান। কালবৈশাখীর ঝড় কিংবা শ্রাবণের বজ্রবিদ্যুত উপেক্ষা করে সে যাত্রার ঘনঘটা, যেজন্য ঘরে ঘরে আরামের শয্যাতল ও প্রেয়সীর বাহুবন্ধন ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়তে হয় জীবনের প্রবল অভিসারে। এই অগ্রসর-যাত্রার লক্ষ্য পশ্চাতের টান উপেক্ষা করে নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি ; আর প্রেম সেখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্বাধীন অধিকারের চেয়েও বলিষ্ঠতর মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার ইচ্ছায় আরক্ত। সবলা নারী নিয়মতান্ত্রিক অধিকার বোধেই তৃপ্ত নয়, তার আকাঙ্ক্ষায় ইস্পাতের দৃপ্ত ঝলসানি : (২)

"বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে।"

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে পূর্বে-উল্লিখিত ক্ষুব্ধ তীব্রতার রৌদ্রালোকিত প্রকাশের পর থেকে 'মহুয়া'র বলিষ্ঠ প্রেমোত্তাল পর্বের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আবার যেন সূর্যগ্রহণ—বন্দনাগীতি এবং সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির এক অনবদ্য শিল্প সুষমার প্রকাশ যেন ললিত কণ্ঠে পরিস্ফুট। এই মধ্যপর্বে প্রেমের বর্ণাঢ্য অভিষেক ও গভীর অনুভূতিময় প্রকৃতি-চেতনার ফাকে ফাঁকেও কবি অকস্মাৎ 'ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়' রুদ্ধদ্বার খুলে ফেলতে চেয়েছেন, বেরিয়ে এসে অনুভব করতে চেয়েছেন সৌন্দর্য আর আনন্দের স্বাপ্নিকতা ও বাস্তবতার ঢেউ :

"এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস ?" (পূরবী)

বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস রাবীন্দ্রিক ভুবনের কাব্যময়তাকে তার মরমী রম্যতাকে বার বার স্পর্শ করে যায়, মনে পড়িয়ে দেয় ধূলিমাখা মানুষের আঙ্গিনা। তাই 'ক্ষণিকা' 'কল্পনার' উচ্ছল আবেগ কিংবা 'পূরবী'র বিষণ্ণতা পেরিয়ে 'মহুয়া'র নিটোল প্রেমের সংরক্ত ঋতুতে পৌঁছে যান কবি। 'মহুয়া'র কাল বস্তুতঃ দুই পর্বের সন্ধিলগ্নের পর্যায়, একদিকে পূর্ববর্তী প্রেমানুভূতির রহস্যময়তা যেমন অন্তর্হিত, তেমনি অন্যদিকে এক পেশী সচ্ছল সংরক্ত আবেগের উচ্ছল আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রেম আকাশের নক্ষত্র নীলিমায় পাড়ি জমাবার বদলে রুক্ষ্মদিনের দুঃখে নিজেকে চিনে নিতে নিতে শপথের গরিমায় বলতে পারে ঃ (৩)

"পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি।"

প্রকৃতপক্ষে প্রেমিক-বলিষ্ঠতাই যেন রবীন্দ্র-চেতনায় আরেক পার্শ্ব পরিবর্তনের সূচনা, যা মধ্যপর্যায়ের সৌন্দর্য পিপাসা ও রহস্যময়তাকে পশ্চাদটান থেকে মুক্ত করে অগ্রসর চেতনার চাকায় বেঁধে দিয়েছে। রাজনীতি-সমাজনীতি, সর্বোপরি মানব সমস্যা নিয়ে কবির প্রগাঢ় সংশ্লিষ্টতা, যা গভীরতায় ও বলিষ্ঠতায় এক নতুন গুণগরিমায় আক্রান্ত। জীবনের শেষ দশকটি এবং তার আশেপাশে কিছু সময় এই ইতিবাচক সমৃদ্ধতায় চিহ্নিত। একটু সতর্ক অনুধাবনেই দেখা যাবে যে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া-ভ্রমণের পর থেকেই এই নব্যচেতনার আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশ। এই চেতনার প্রভাব তাঁর প্রবন্ধে, কবিতায়, নাটকে সর্বত্র প্রতিফলিত ; এমন কি জীর্ণ দেহভার ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও কবি সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৬ সালে রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কারণে বর্জন করতে না হলে সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে আরো এক দশকের সচেতন অধ্যায়ের সমৃদ্ধ সংযোজন সম্ভব হতো।

সেই যাই হউক, মহুয়ার পর এই পার্শ্বপরিবর্তনের গুণগত পর্যায়ের শুরু সম্ভবতঃ কবিতার ক্ষেত্রে 'পরিশেষ' থেকে 'পুনশ্চ' হয়ে পরবর্তী

কাব্যচর্চায়, মাঝখানে 'সানাই' এক ব্যতিক্রম, আর নাটকের ক্ষেত্রে 'কালের যাত্রা'য় এই নব্যচেতনার সুঠাম প্রকাশ। এই এক দশকের কিছু অধিককাল রবীন্দ্র-রচনা বিশিষ্টতায় সমৃদ্ধ, এবং এই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত সুর গণচেতনায় অঙ্গীকৃত, বিশ্ব ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে প্রকট এবং বিশ্বশান্তি ও ধন-সাম্যের প্রত্যাশায় স্পন্দিত। শুধু তাই নয়, আত্মসমালোচনার তথা আপন সীমাবদ্ধতার যে সুস্পষ্ট বয়ান এই স্বল্পকালীন পর্বে ফুটে উঠেছে তা যেন কবির পূর্ব সৃষ্টির এবং লালিত বিশ্বাসের গায় খোদিত এক সুতীক্ষ্ণ এপিটাফ। দেশীয় রাজনীতি, বিশেষতঃ বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই সমৃদ্ধ পর্বটির উপর গবেষণামূলক আলোকপাত রবীন্দ্র-মানসের নতুন ও ইতিবাচক পরিচয় তুলে ধরবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তুলনামূলক বিচারে আমাদের মনে পড়ে যায় তিরিশের সেই ক্রান্তিযুগে তৎকালীন আধুনিক কবিতার নায়কদের, যারা বিষাদ, নৈরাশ্য বিচ্ছিন্নতা বোধ, যৌনতা এবং মৃত্যুচেতনা পশ্চিমা আধুনিকদের কাছ থেকে ধার করে কবিতার জন্যই কবিতার অভিনন্দনে মুখর। কবিতার উদ্যানে রাজনীতির প্রবেশ নিষেধের মাধ্যমে তাদের একাংশ কবিতার আভিজাত্য রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রতি যার কোন শ্রদ্ধা ছিলোনা, সেই নান্দনিক কবি যখন বলেন : "বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী"(৪) তখন সেই রাজনৈতিক-নৈতিবাদের উৎসমুখটির পরিচয় উদ্ঘাটিত হতে দেরি হয়না।

কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণোত্তর তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ বক্সা ক্যাম্পে বিনাবিচারে আটক বন্দিদের উপর লেখা কবিতা(৫) দিয়েই যেন তাঁর পার্শ্বপরিবর্তনের প্রত্যক্ষ সূচনা ঘটালেন (১৯৩১)। এরপর হিজলি-চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে অসুস্থ কবির গড়েরমাঠে লক্ষাধিক মানুষের সভায় ভাষণ (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) যেন সেই সচেতনতার হীরকদীপ্তি। বাস্তবিক হিজলি-চট্টগ্রামের ঘটনা যেন তাঁর সত্তায় এক প্রচণ্ড বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিলো যার ফলে একদা-আভিজাত্যে লালিত কবি আরো নিবিড় উত্তাপে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসে পেঁছাতে এবং তাদের দুঃখ বেদনার শরিক হতে পারলেন। আর এই ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যেই ক্ষুব্ধ কবি-চিত্ত আলোড়িত করে জন্ম নিলো ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ 'প্রশ্ন' (পৌষ, ১৩৩৮)। খুনী শাসকদের ক্ষমা করা গেলনা। মত ও পথের অনৈক্য সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী তরুণদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতে হলো তাঁকে কবিতার অমোঘ অঙ্গনে :

"আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সংগীত-হারা,"(৬)

এমনি করেই বাঁশী ফেলে বড় দুঃখে তাকে নিতে হয়েছিলো ভেরী, (সে প্রসঙ্গ পরে বিবেচ্য)। বাস্তবিক এই কবিতায় রবীন্দ্র-মানসের যে গুণগত পরিবর্তন পরিস্ফুট তা যেন তার পূর্ববর্তী সমস্ত প্রতিবাদ, ঘৃণা, রোষ ইত্যাদির তুলনায় স্বতন্ত্র, যেন নবজন্মের পাঠ নিলেন কবি। ঘাতকদের উদ্দেশে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপের অতি অল্পকালের মধ্যেই চাইলেন (জুলাই, ১৯৩২) পুরনো আবরণ ফেলে দিয়ে নতুন কালের গতি প্রকৃতি বুঝে নিতে। কিন্তু সত্তর বছরের অধিক বয়োবৃদ্ধ কবির পক্ষে একাজ যে কী দুরূহ তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হবার কথা নয়। এতদিনকার বিশ্বাস ও চিন্তা-ভাবনার 'সম্বলটুকু' নিয়েই 'একালের ঋণ শোধ করার' অসাধ্য-সাধনে এগিয়ে যেতে চাইলেন তিনি 'স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে'(৭)

"আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।...
"তোমাদের যে বাসার কোণে থাকি
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই।
তাইতো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে।"

এমন কি পূর্বেকার বিশ্বাস ভেঙ্গে মৃত্যুর উপর জীবনের বিজয় ঘোষণা(৮) সম্পন্ন করলেন (তুলনীয়ঃ 'যেতে নাহি দিব')। বাস্তবিক 'পরিশেষ' কবির প্রাক-তিরিশ পর্বে লালিত মানসিকতার যেন প্রায়-পরিশেষ পর্ব। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের রূপ যেমন করুণ তেমনি বিষমতায় ভরা। প্রতিটি পদক্ষেপে কবি অনুভব করেছেন জরার প্রবল প্রভাব ('জরতী')। প্রায় তিন বছর পর লেখা 'শেষ সপ্তকে'-এ আত্মবিশ্লেষী 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির আভাস পাওয়া যায় এখানে ('সাথী')। এরপর যেন কবি সত্যি সত্যি এক বন্দরের কাল শেষ করে আরেক বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি জমালেন, দ্বিধা আর সংশয় ভেঙ্গে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা শুরু

হলো। কবির ভাষায় 'একতারা ফেলে তুলে নিতে হোল ভেরি।' কিন্তু আমাদর বিশ্বাস একতারা তিনি ফেলে দেননি, একপাশে রেখে দিয়েছিলেন মাত্র ; যাতে মাঝে মাঝে হাত বাড়ালেই কাছে পাওয়া যায়, একতারার ঝংকারে নিজেকে সতেজ করে তোলা যায়। কারণ অর্ধশতকের অভ্যাস কি মানুষ রাতারাতি বিসর্জন দিতে পারে ? তবু শিল্পীর সততা যে তাকে বরাবর (প্রবল প্রয়োজনের কালে) বিশুদ্ধ রসের চর্চায় জীবন সমাপন করতে দেয়না, রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেবিষয়ে দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। এমন কি 'নবচেতনায়' উত্তরণের প্রক্রিয়ার শুরুতেই রাশিয়ার চিঠিতে তিনি সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন :

> "একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব, এই আমার একমাত্র কাজ। কিন্তু যখন একথা কাউকে বোঝাতে পারলুম না যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি পল্লীতে, তখন কিছুক্ষণের জন্য কলম কানে গুজে একথা আমাকে বলতে হল—আচ্ছা, আমিই একাজে লাগব।"(৯)

এই বাস্তব-চেতনার হাত ধরেই কবি "নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন থেকে বেরিয়ে" এসেছিলেন, এবং পার হতে পেরেছিলেন ভাববাদের চোরাবালি। সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নির্যাতীতের ডাকে সাড়া দিয়ে। রবীন্দ্র-মানসের এই ধীরগতি শৈল্পিক বিবর্তন ও সততা নিঃসন্দেহে নিরীক্ষা ও সমীক্ষার বিষয়। বলা বাহুল্য, রাতারাতি বিপ্লবী পর্যায়ে উন্নীত হবার মতো ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের নয়, এবং পরিস্থিতি বা পরিবেশটিও তেমন অনুকূল ছিলোনা সে দিক থেকে।

উল্লিখিত নব্যচেতনা শিল্পীর মানস-গভীরে গুণগত পরিবর্তনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলো বলেই তাঁর সৃষ্টিশীলতায় পরিবর্তনের প্রভাব ধীরে ধীরে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, যার ফলে কবিতায় এলো সুনিশ্চিত স্বাদ বদলের লক্ষণ। শুধু বিষয়বস্তুতেই যে সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটলো সাঁওতাল নারীপুরুষ, গয়লানি, দরিদ্র কেরানী, চাষী, জেলে, মুটে প্রভৃতির আনা-গোনায় ও জীবন-চিত্রণে তাই নয় ; প্রকরণিক চেহারায়ও সূচিত হলো গভীর পরিবর্তন। গদ্যছন্দের সবল দৃঢ়তায় সাধারণ মানুষের জীবন-নাট্য ধুলো কাদা মেখে হাসিকান্নায় ভাস্বর ও চিত্রময় হয়ে উঠতে লাগলো। আধুনিক বাংলা কবিতায় তিরিশ

ও তিরিশোত্তর কালে উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রময়তায় যে সমৃদ্ধি ঘটেছে, তার পূর্ব-ঐতিহ্যে রাবীন্দ্রিক কবিতার এই পর্ব নিঃসন্দেহে চিহ্নিত। 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকে পরবর্তী সৃষ্টি সম্ভারের প্রকরণিক পর্যালোচনায় এই তথ্যটি প্রমাণিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শব্দ-চয়ন, উপমার ব্যবহার, পদের দেহ-কাঠামো প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বচরিত্রের বদল বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। এদের ব্যবহারে কোমল লালিত্য কিংবা অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্নতার চেয়ে রূঢ় বা কর্কশ মাটির চেহারা ও চরিত্র ফুটে উঠেছে। "মরচে-ধরা কালো মাটি" কিংবা "ধূসর ছেলেমানুষি" অথবা "লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়" "বিকেলের প্রৌঢ় আলোয়" আমাদের যেন একালের শিল্পরীতির ঘরকন্নার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। একদিকে কথকতার স্বচ্ছল বয়ানে যেমন আটপৌরে জীবনচিত্র ফুটে উঠে, তেমনি অন্যদিকে সুতীক্ষ্ণ শব্দের চয়নে দৃপ্ত গতিছন্দের সৃষ্টিতে যেন শক্তির উৎসমুখ খুলে দেয়, রক্তে জাগায় সুতীব্র শিহরণ, স্পন্দিত কলরোল ঃ

"নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্তঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও—"(১০)

আবার সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কবির ধিক্কার যেন শক্ত ব্রাশের টান, তাতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে শক্তির দৃপ্ত ব্যঞ্জনা, ঘোষণার বলিষ্ঠতা ঃ

"রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্চ্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।"(১১)

কিংবা ঘরছাড়া দিকহারাদের মৃত্যুর অভিসার-যাত্রায় স্পন্দিত আহ্বান, যা বুকে জাগায় ঢেউয়ের উদ্দামতা ঃ

"বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে
ঘর-ছাড়ানো ডাক
পায়নি আরাম, পায়নি বিরাম,
চায়নি পিছন ফিরে।"(১০)

এ প্রসঙ্গে কবির অন্বিষ্ট ছিলো তাঁর সৃষ্টিশীলতার গভীর ও গুণগত পরিবর্তন, যাতে করে তার সৃষ্টিতে 'সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি জ্বলে, আর নিজের ব্যথা চাপা দিয়ে সবার কান্না হাজার তানে বিশাল বিশ্বসুরে মিলিয়ে দিতে পারে'।(১২) কবির এই প্রার্থনা আমাদের আলোচ্য পরিবর্তনের স্বপক্ষেই রায় দেয়। লক্ষণীয় যে এই পরিবর্তনের স্পর্শ কম বেশী খোয়াই, ধলেশ্বরী তীর থেকে রূপনারাণের কূল পর্যন্ত প্রসারিত। প্রসঙ্গতঃ 'বাঁশি' কবিতাটির বহিরঙ্গ ও বক্তব্যের প্রকৃতি প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কয়েকটি স্তবকে বিত্তহীন এক যুবকের বেঁচে থাকার প্রাণান্তিক সংগ্রামের মৌল রূপরেখার প্রেক্ষিতে সীমাহীন দুঃখ-দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার ছবি অঙ্কিত, তারই সমান্তরাল চরিত্রে বিধৃত হয়েছে বিলাসী নাগর সভ্যতার অভিশপ্ত সর্বনিম্নতলায় অবস্থিত কোনো এক কিনু গোয়ালার গলির শ্বাসরুদ্ধকর অপ্রাকৃত পরিবেশ ; গলিত পচা আবর্জনায় দূষিত পরিবেশটি যেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার ছোট্ট এক টুকরা ক্যানভাস :

লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।...

"বর্ষা ঘনঘোর।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কো,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।"

এমনি এক ভয়াবহ পরিবেশের শিকার কোনো একটি তরুণ মনের রোমান্টিক প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত মাধুর্যে ভরে উঠার পরিবর্তে মর্মান্তিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াটাই বাস্তবোচিত, এবং সেই করুণ বাস্তবতার নিখুঁত রূপচিত্র কয়েকটি পংক্তির সংহত আঁচড়ে মূর্ত :

"লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটাতো রক্ষা পেলে,
আমি তথৈবচ।"

রোমান্টিকতার বাহারী বেলুনটি বাস্তবের একটি খোচায় চুপসে গেল। কিন্তু যৌবনের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা যন্ত্রণাদীর্ণ মনে কল্পনার ছবি হয়ে তৃপ্তির আশ্রয় খোঁজে। যাকে বাস্তবের ঘরে পাওয়া গেলনা, মনের গভীরেই তাকে নিয়ে সুখদায়ী রোমন্থন চলতে পারে ঃ

"ঘরেতে এলনা সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

স্বভাবতঃই এমনি এক মানসিক অবস্থায় সুরে-সঙ্গীতে কিংবা নিসর্গের আলোছায়া সমৃদ্ধ রূপসী প্রান্তরের অনুকূল আবহে বেদনার সুগভীর উৎসমুখ খুলে যায়, তার সমগ্র ভুবনে বইতে থাকে বিষণ্নতার অবিরাম হাওয়া, সমস্ত আকাশে বেদনার নীলাভা ফুটে উঠে, তখন সেই তীব্র রুক্ষ্ম আঘাত প্রতিরোধ করতে প্রয়োজন হয় কাল্পনিক পরিপূর্ণতার ছবি আঁকার, আর স্থান-কাল-পাত্র সমন্বয়ে ছবিটি ক্ষণিক পূর্ণতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে যায়। স্থায়ী বাস্তবের সঙ্গে ক্ষণিক কল্পনার বৈপরিত্যে বিষয়টি কবিতার গুণ-গরিমার ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কল্পনার এই বাস্তবধর্মী রূপময়তায় বেদনার প্রতীক স্পর্শকাতর মুহূর্তটি প্রাণ পেয়েও রক্ত ঝরাতে থাকে বলেই ঢাকাই শাড়ির রমণীয় মাধুর্য সত্ত্বেও বাস্তবতার গায়ে আঁচড় পড়ে না এতটুকু। কল্পনা ও বাস্তবের বেদনাঘন পারাপার যেমন মনস্তত্ত্ব সম্মত, তেমনি এ অভিজ্ঞতা তো ব্যক্তি মাত্রেরই মানস-ধৃত সত্য। একে কখনোই নান্দনিকতা কিংবা ভাববাদিতার সমান্তরাল করা চলেনা।

এইসব শ্রীহীন রুক্ষ্মতার বা রূঢ়তার আলেখ্য কিংবা অতি আটপৌরে নগ্ন বাস্তবের রূপময়তা রঙে রেখায় আধুনিক কবিতার প্রকরণিক আলংকারিকতার সপ্রতিভ ও প্রাথমিক পথ রচনা করতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। তাই 'শীতের রোদ্দুর সেগুনবনে স্তম্ভিত হয়ে থাকার দৃশ্যচিত্রে' কিংবা 'মাটির তলায় অন্ধকারে ঘুমন্ত বীজের অভাবিত স্বপ্ন দেখার' অনুভব-চিত্রে আমরা সেই আধুনিক প্রকরণের পূর্বসূরীকেই

প্রত্যক্ষ করি। এই পূর্বাধিকারের ধারাস্রোত ও প্রভাব চিহ্নিত করতে গেলে অনেক উদাহরণের মধ্যে অতি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে তিরিশের অসামান্যতায় দীপ্ত অন্ততঃ একটি শিল্পমনস্ক সত্তায় এই প্রকরণিক ঐতিহ্যের পরিশীলিত প্রয়োগের বৈচিত্র্যময় ও ব্যাপ্ত গুণগ্রাম। শুধু বিষ্ণু দে নয়, রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যধারার বিশিষ্ট স্রষ্টাদের অনেকের মধ্যেই এই প্রভাব সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত, এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই প্রভাবের কয়েকটি রূপরেখা দেখতে পাবো। শুধু ভাষাশৈলী নয়, বিষয়গত মহিমাও অধিকতর ব্যাপ্তিতে এই পর্বে প্রকাশ পেয়েছে। এবার আর নিচুতলার সাধারণ মানুষের প্রতি চিরাচরিত মমত্ববোধ নয়, এবার তাদের সাথে একাত্মতা অনুভবের ফলশ্রুতি রূপে কবির নিজস্ব পদ্ধতিতে ঘোষণা শোনা গেলো ঃ(১৩)

"কবি আমি ওদের দলে—
    আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন...
"আমি পংক্তিহারা···
    "আমি জাতিহারা।"

নিজেকে 'ব্রাত্য' বা 'পতিত' ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই শিল্পীর নবজন্ম বা পরিব্যক্তি চিহ্নিত হলো। এক্ষেত্রে কবির শ্রেণী-একাকারত্ব ঘোষণা, বলা বাহুল্য প্রধানতঃ মানবিকতা প্রসূত, শ্রেণী-সচেতনা বা সর্বহারা-রাজনীতি প্রসূত নয়। তবু নিজেকে সাধারণ্যের পংক্তিতে এনে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায় এই পর্বে রবীন্দ্র-মানসের তথা রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা বিধৃত। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করে মানবমিলনের ও মৈত্রীর ক্ষুধা বুকে নিয়ে মহাপুরুষদের ধর্মনীতির গণ্ডি পেরিয়ে কবি নেমে এলেন 'দেবলোক থেকে মানবলোকে' ঃ ক্ষুব্ধ-চৈতন্যে ঝড় উঠলো যথার্থ জ্ঞানের আলোকে মননকে স্নাত করার উদ্দেশ্যে ; আচার অন্ধতা দূর করার অভিপ্রায়ে ঃ

"যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙ্গো ভাঙ্গো, আজি ভাঙ্গো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"(১৪)

শিক্ষা-জ্ঞান প্রভৃতি আদর্শবাদী তত্ত্বকথায়ই সব সমাপন সম্ভব করা গেলনা। তাই নিদারুণ ঘৃণার ধিক্কার নিক্ষেপ করলেন 'নেকড়ের চেয়ে তীক্ষ্ণ-নখ

মানুষ-ধরা দলের' দানব পিপাসার প্রতি ; প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন 'যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার' বিরুদ্ধে। দেখা গেল, আপন সীমাবদ্ধতার সীমানা অংশত ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছেন যুগান্তরের যাত্রিক রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩২ সালে লেখা 'কালের যাত্রা'য় ধনতন্ত্রের দুর্গ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে এসে জীবনের প্রান্তিক সীমানায় দাঁড়িয়ে মানব-চৈতন্যের বিরুদ্ধে পশু শক্তির তাণ্ডবলীলা দেখতে দেখতে চৈতন্যের পরিপূর্ণ মুক্তি-স্নান সমাপন করলেন। 'মানুষের তীব্র অপমানে' সত্তায় জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা ঃ(১৫)

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তি গুহা হতে...
...দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ,"...

এতোকালের সামঞ্জস্যধর্মী রৈবিক চেতনা আজ দ্বিধা ও ভীরুতার জড় আবরণ সজোরে ফেলে দিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শক্তির জন্য উচ্চকণ্ঠে যখন আহ্বান জানায়, তখন পাঠকের জন্য বিস্ময় এসে থমকে দাঁড়ায়, এবং এর অন্তর্নিহিত তেজোদীপ্তির বিচ্ছুরণ নৈবেদ্যর শান্ত সনেটগুলোর সঙ্গে তুলনীয় ঃ

"......মহাকাল সিংহাসনে—
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্র বাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিৎ বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন...(১৫)

এবার শুধু ধিক্কারই শেষ কথা নয়, জনতাকে ডাক দেন দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার জন্য। কারণ, চারিদিকে বিশেষতঃ গোটা ইউরোপ জুড়ে সাম্রাজ্যলিপ্সু ফ্যাসিবাদের যুদ্ধের মহড়া চলছে, তাদের বিষনিঃশ্বাসে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র মৃত্যুর সম্মুখীন ঃ

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—

বিদায় নেবার আগে তাই
   ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
      প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।" (প্রান্তিক ১৮ নং কবিতা)

যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে (১৯৩৭) লেখা এই কবিতা শান্তি বা ক্ষমার আহ্বান নয়, ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী গণ-দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জ্বলন্ত ঘোষণা। বয়সের ভার, জরার প্রভাব অগ্রাহ্য করে এককালের শান্তিবাদী কবির এই আহ্বান, বিশেষ করে স্পেনে, আবিসিনিয়ায়, চীনে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের উন্মত্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে ফেটে-পড়া জ্বলন্ত ঘৃণা নিঃসন্দেহে পরবর্তী যুগের সংগ্রামী কবিদের জন্য উজ্জ্বল ঐতিহ্য। ১৯৩৮ সালে পঁচিশে বৈশাখে আবার কবি ঘৃণায় ফেটে পড়লেন ক্ষুব্ধ, লুব্ধ, মাংসগন্ধে মুগ্ধ ফ্যাসিস্টদের উদ্দেশে, এইসব "মানুষ জন্তুর হুহুংকার" সত্ত্বেও প্রবল আত্মবিশ্বাসে কবি মানুষের বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন :

"...বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্যঅঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারেনা কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"(১৬)

বলা বাহুল্য, এ সময় গোটা ইউরোপ তথা বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের অশ্বখুরের তীব্র ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—হিটলার- মুসোলিনি-ফ্রাংকো-তোজোর দল নরমাংসের স্বাদে লোলুপ জিহ্বা প্রসারিত করে চলেছে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙ্গে ফেলতে বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশের প্রধানতম কবি যখন এই অশুভ শক্তিচক্রের বিরুদ্ধে যৌধেয় হুংকারে প্রদীপ্ত, তখন বিশুদ্ধ শিল্পীগোষ্ঠীর দল আধুনিকতার নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্বপক্ষে, যৌনতাবোধের প্রাধান্যে ও বিচ্ছিন্নতাবোধের গরিমায় ড্রয়িংরুম মুখর করে তোলেন। আজ সেইসব শিবির থেকেই শাক্ত রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে সৌন্দর্য-চেতনা ও বিশুদ্ধবোধের কবিরূপে। এগুলো কি উদ্দেশ্যমূলক বা রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ড নয়? নয় রবীন্দ্রনাথকে দক্ষিণী শিবিরের চোরাবালিতে নিমজ্জিত করবার চেষ্টা?

কিন্তু শেষ দশকের রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই নতুনতর মূল্যবোধে আক্রান্ত, তাঁর নিরলস সাধনা ছিলো যাতে "বধির যুগের প্রাচীন প্রাচীর, মৃত,

পুরাতন জড় আবরণ" ভেঙ্গে ফেলে সেতারে পুনরায় নতুন সুরে তার বেঁধে ঝংকার তুলে আপন পরিচয়ের নতুনত্ব জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়, বলা যায় ঃ

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।"(১৭)

সাধারণ-মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং তাদের একজন রূপে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কবিকে যেন পরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্তের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। 'নবজাতক'-এ এসে কি নতুন করে জন্ম নিতে হোল, সৃষ্টি করতে হোল নিজেকে নতুন করে ? না, তা নয়। পুনশ্চ-পত্রপুট-প্রান্তিক-সেঁজুতি'র ধারাই গভীর স্বচ্ছতায় ব্যাপ্ত হয়ে ঘোষণা করছিলো যে শেষ দশকের রবীন্দ্রনাথ গভীরতর অর্থে 'মানুষের কবি' অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী-চেতনার শিল্পী। তাই কবি জানেন, নতুন সৃষ্টির প্রশ্নে ব্যাপক ধ্বংস ও পরিবর্তনের প্রয়োজন, সংস্কারবাদিতার বাধা-ধরা পথে পাওয়া যাবেনা এই অন্বিষ্টকে। তাকে পেতে হবে সংগ্রামের পথে, নবজাতকের ত্যাগে, শক্তিতে রচিত নবযুগের পথে। আর এই রক্ত-পিচ্ছিল-পথেই আসবে শান্তি ঃ

"রক্ত-প্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলন তীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।"(১৮)

রবীন্দ্রনাথকে কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে 'জন্ম রোমান্টিক'। যেন একালের সমালোচকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে পরম কৌতুকভরেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'রোমান্টিক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু কবি জেনেছিলেন তিক্ত অভিজ্ঞতার বিনিময়ে যে, রোমান্টিকতাও বাস্তবতার সচেতন ভূমিতে শিকড় না মেলে বাঁচতে পারেনা। আর পারেনা বলেই কি রোমান্টিকতার বহিরাবরণ বা আপাত-মুগ্ধতা ছুঁড়ে ফেলে একই কবিতায় বীত-রোমান্টিক উপসংহারের বাস্তবতায় উপনীত হতে হলো তাঁকে। জানাতে হোল যে বাস্তব জগতের আনা-গোনার পথ তার অচেনা নয় এবং সেখানকার দেনা

শোধ করেই তার যাত্রা, তা রোমান্টিকতাই হউক বা বীত-রোমান্টিকতাই হউক। বাস্তবতার সে ডাক এবং কর্তব্য তাঁর জীবনাদর্শে উপেক্ষার নয় :

"দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি' বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।"(১৯)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে চলার কালে কবি কিছুকাল তাঁর 'সানাই' তুলে নিয়ে চেয়েছিলেন অই নারকী বীভৎসতার আয়োজন-মুখরতা থেকে শ্রুতি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখতে, কিন্তু পারলেন কই ? "স্বপ্নের বাঁশিটি ফেলে" দিয়ে তাঁকে বলতে হলো : "পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি"—অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োজনের ডাকে তাৎক্ষণিকতার দাবি তাঁকে পুরোপুরিই মিটিয়ে দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাত্র তিনটি বৎসর বেঁচে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ; এবং এরই মধ্যেও রোগের আক্রমণে বারবার মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে পেঁছাচ্ছিলেন। আমাদের দেশের প্রথাসিদ্ধ ঐতিহ্য মেনে এ অবস্থায় ভক্তিবাদের বিনম্র কক্ষের স্তব্ধতায় আপনাকে সমর্পণ করাটাই ছিলো স্বাভাবিক (বিদ্রোহী কবি নজরুলও এই দৃষ্টান্তের ব্যতিক্রম হতে পারেন নি) ; কিন্তু তার বদলে কবি তখনো এ বাস্তব পৃথিবীর ভালোবাসায় আপন মুগ্ধতা প্রকাশ করেন, দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন 'ভাঙ্গনের' শুভ ফলশ্রুতির উপর ; কারণ ভাঙ্গনের মাধ্যমেই জন্ম নিতে পারে সৃষ্টিশীলতা এবং নতুনের অবয়ব (১৯৪০)।

"দারুণ ভাঙ্গন এযে পূর্ণেরই আদেশে ;
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে—
গুড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নতুন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।"(২০)

তেমনি অনুভব করেন, 'একদিন বন্যা নেমে শৈবালের দ্বীপ যাবে ভেসে।' এই প্রবল বিশ্বাসই জীবনের শেষ ক'টা বছরের গায়ে নানা রঙের আল্পনা এঁকে দিলো,—কখনো রক্তাভ, কখনো হরিত, কখনো বা মিশ্র শাদা-কালো। শুয়ে, বসে রোগ-জর্জর ক্লান্ত শরীর নিয়েও দেখতে পান, অনুভব করতে

পারেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, প্রবলের অত্যাচার, এমন কি অধিকতর সংবেদনশীলতায় গভীর হয়ে উঠে এই প্রতীকি অনুভব ঃ

"পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।"(২১)

'জীবনের দুর্জয় চেতনার প্রতি বিশ্বাস' তবু নষ্ট হয়না। গভীর সংবেদনশীলতা নিয়ে এঁকে চলেন কর্মিষ্ঠ মানুষের ছবি,—চাষী, তাঁতী, জেলে, মেছুনী, মাঝি, শ্রমজীবী মানুষ কেউ বাদ যায়না। আবার কখনো আঁকেন আপন আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার ব্যর্থতা, বা অপূর্ণতার বেদনা রেখায় ও রঙে।

তাই আশি বছরে পৌঁছেও কবি দেখতে পারেন, ভবিষ্যত পৃথিবীর রৌদ্রালোকিত সমৃদ্ধ চেহারা ; অন্ধকারের যবনিকা সরিয়ে ফেলে সেই আলোকিত পৃথিবী গড়ার কাজে আপন ভূমিকার গুরুত্ব পবিত্র শপথের মতো মনে হয় তাঁর কাছে, স্বীকার করে নেন সে গুরুদায়িত্বের ভূমিকা ঃ "আমারো আহ্বান ছিলো যবনিকা সরাবার কাজে।" সাবিত্রী পৃথিবীর জন্য মন মমতায় ভরে ওঠে। রহস্যময়ী মনে হয় এই অপরূপ ধরিত্রীকে। হার্দ্য কণ্ঠে উচ্চারণ করেন ঃ "এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।" তবু উদ্দিষ্ট ভূমিকা পালনে আপন অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। সুস্পষ্ট ঘোষণার মতো বলে উঠেন ঃ "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।" নিজের বিরুদ্ধেই চলে অভিযোগ, আত্মসমালোচনা ও লড়াই-এর পালা ঃ

"জমা হয়েছিলো আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।"(২২)

সমাজের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে বসে যে বিত্তহীন মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানা যায়না, এ সত্য তাঁর কণ্ঠে শাণিত তরবারির মতো ঝলসে উঠেছে। সম্পূর্ণ উদ্ধারণযোগ্য এই কবিতাটিতে (ঐকতান) কবি

জানাচ্ছেন যে, যাদের উপর ভর দিয়ে সমস্ত সংসার চলছে, সমাজের সেই নীচু তলার প্রাঙ্গণে প্রবেশের শক্তি তাঁর ছিলো না ; এদের জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে শিল্পের সৃষ্টিশীলতায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়না। এর অর্থ, কবি শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন-নির্ভর কল্যাণী ভূমিকা স্বীকার করছেন, বিশুদ্ধ শিল্পের তথাকথিত নান্দনিক ভূমিকার পরিবর্তে। আমাদের বিশ্বাস কবিজনোচিত এই বিনয় পুরোপুরি সঠিক নয়, কারণ ও-পাড়ার মানুষকে তিনি প্রায়শই দেখেছেন ; দেখেছেন তাদের সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, এঁকেছেন সেইসব ছবি। তাছাড়া বাংলার পাড়াগাঁর মানুষকে যে তিনি একান্ত সান্নিধ্যে এসে দেখেছেন সেকথা প্রবন্ধে বহুবার সজোরে প্রতিপন্ন করেছেন ; গল্পগুচ্ছের প্রেরণা যে ঐসব মানুষের জীবন-যাপনের ছবি-ছায়া, সেকথাও উল্লেখ করেছেন একাধিক বার ঃ

> “মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি।”(২৩)
>
> “পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে।...যে নিরন্তর ভালবাসার দৃষ্টিতে পল্লীগ্রামকে আমি দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে।...আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে ; কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবেনা।”(২৪)

প্রকৃতপক্ষে গল্পগুচ্ছের একটি বৃহৎ অংশে বাংলার পল্লীজীবনের ছবি, সামাজিক সমস্যার ছবি ধরা পড়েছে। কাজেই শ্রেণীসচেতন সংগ্রামী কবিকে আহ্বান করা সত্ত্বেও এটুকু অস্বীকার করা যাবেনা যে, রবীন্দ্রনাথ আপন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ছবি এঁকেছেন মাঝে মাঝে, আর নিপীড়িত সেই সব মানুষের স্বপক্ষে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। তাই ফ্যাসিবিরোধী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে বসে থেকে কবি শুধু ‘সানাই’ বাজাননি, একই সাথে ঝড়ো হাওয়ার সুর তুলে সব জীর্ণতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছেন নতুন দিনের সফল সম্ভাবনার মুখে ঃ

“দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।...

হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।"(২৫)

যুগ-সংকট ও যুগের দাবী উড়িয়ে দিতে পারেননি বলেই শান্তিবাদী তথা মানবতাবাদী কবিকে "শান্তির ললিত বাণী" ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝড়ো যুগের দামামা বাজাতে হয়েছে, বাঁধভাঙ্গার গানে উদ্দাম হয়ে ওঠতে হয়েছে, প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হয়েছে "রক্তমাখা হিংস্র" আক্রমণের বিরুদ্ধে, এবং একথা সবশেষে স্বীকার করতে হয়েছে যে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের মাধ্যমেই "বীভৎস তাণ্ডবে এ পাপ যুগের অন্ত হবে।" সাজানো সদিচ্ছার আবেগে এর অবসান হবেনা, হতে পারে না ; আর নতুন সৃষ্টির প্রক্রিয়াও একই পথের যাত্রিক ঃ

"আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।" (জন্মদিনে)

বুঝতে ভুল হয়না যে, প্রতিটি দুর্বল দেশেরও আত্মরক্ষার পন্থা এই স্বীকৃত পথেই ধৃত ; কারণ যুদ্ধবাজদের অন্ধ যাত্রা কোনো সদুপদেশ মানেনা ; তাই

"রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।"(২৬)

লক্ষ্য করবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের এই বিবর্তন বিস্ময়কর হলেও বাস্তবতা-নির্ভর। লালিত বিশ্বাস ও মোহভঙ্গের পর এবং প্রত্যাশার নিটোল মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার পর প্রবল 'ইতি' বা গভীর 'নেতি'র যে-কোন একটিতে স্থিত হওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে ররীন্দ্রনাথ ইতি'র দিকটাই বেছে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-মানসের পথ-পরিক্রমা অবধারিত মোহভঙ্গের ক্রম-অগ্রসরমান ইতিহাস। কারণ, কবি নিশ্চিত জানতেন যে "সব কিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে" আর সেটাই কালের ধর্ম। তাই পরিবর্তন যত রক্তঝরাই হোকনা কেন, তাকে আহ্বান করা এবং স্বীকার করে নেয়াই বাস্তব-ধর্ম। যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-নির্ভরতা ভেঙ্গে পড়ার সকরুণ ইতিহাস নির্বিকার

ও নির্মোহ মানসিকতায় উদ্ঘাটন করেছেন কবি 'সভ্যতার সংকট'-এ (১লা বৈশাখ, ১৯৪১)। আমাদের বিশ্বাস, জীবনের শেষ-পর্বে কবির রূপান্তর বা গোত্রান্তর এই নির্ভীক আত্ম-উন্মোচনের কাজে নিশ্চিত সহায়তা করেছিলো। আর নয় লালিত্যময়তা, এবার বাস্তব সত্যের—কঠিনের মুখোমুখী হবার প্রয়োজন এসে পড়লো সব বোঝাপড়া শেষ করে দিতে। আর সে বোঝাপড়া সাঙ্গ হলো 'শেষলেখা'য় 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' লিখে ; আঘাতে-বেদনায় জাগ্রত নবসত্তার উপলব্ধিতে :

"জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করেনা বঞ্চনা।" (শেষলেখা)

এমনি করে এক একটি সমৃদ্ধ পর্বের ছোট ছোট বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা দু-একটি কবিতার বিশদ বিশ্লেষণ ও বিচারে আমরা দেখতে পাবো কবির ক্রম-পরিবর্তনের এবং সচেতনতার বিচারে ক্রম-পরিণতির পর্যায়গুলো,—যার মূল আবেগ সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হবার প্রচেষ্টা, মানব বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র-তীক্ষ্ণ উচ্চারণ এবং গণ-মানুষের বিজয়-ঘোষণার মাধ্যমে যুগধর্ম ও যুগদায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়া। বলা বাহুল্য এসব কার্যক্রমের ফলশ্রুতি হলো সচেতনায় বা অবচেতনায় পূর্বতন কাব্য-মানসিকতাকে বাতিল করে দেওয়া। এই সততা, নব-বাস্তবতার রূঢ়তাকে স্বীকার করে নেবার ক্ষমতা, এবং আত্মসমালোচনার স্পর্ধিত সাহস রবীন্দ্র-রচনার একাংশে এমন গুণগ্রাম আরোপ করেছে, এবং সর্বোপরি একজন সৎ-শিল্পীর সচেতন পরিণতির এমন এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে যে এই শ্রেণী-সংগ্রামের যুগেও তাকে আমরা প্রক্ষেপের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট করতে পারিনা। কারণ এ সত্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে জীবনের অপর পারে স্বভাবসুলভ দৃষ্টি রেখেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ-বাজদের হাত শক্তিশালী করেননি। যদি পশ্চিমের কারো সাথে তুলনা

টানতেই হয়, তবে অনায়াসে বলা চলে যে, এই শেষ এবং অবশেষ পর্বের কবির মহিমা নিঃসন্দেহে টলস্টয় ও রোঁলার সাথে তুলনীয়, এবং তা গদ্যগত পর্যায়ে তো বটেই।

তথ্য-নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যতত্ত্ব’, রচনাবলী-২৩শ (১৩৫৪) : ৪৪২
২. ঐ ‘সবলা’, রচনাবলী-১৫শ (১৩৫০) : ৪২
৩. ঐ ‘নির্ভয়’, ঐ : ৩৫-৩৬
৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ‘প্রতীক্ষা’, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ (১৯৬২) : ৩১২
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বকশাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি,’ রচনাবলী-১৫শ (১৩৫০) : ১৯৪
৬. ঐ ‘প্রশ্ন’, ঐ : ১৯৭
৭ ঐ ‘আগন্তুক’, ঐ : ২৫৪-২৫৫
৮. ঐ ‘মৃত্যুঞ্জয়’ ঐ : ২৪৮-২৪৯ (যেতে নাহি দিব’ কবিতাটির ভাবদ্যোতনার সাথে এ কবিতার ভাববৈপরিত্য লক্ষ্যণীয়)
৯. ঐ ‘রাশিয়ার চিঠি-৩’ রচনাবলী-২০শ (১৩৫২) : ২৮৪
১০. ঐ ‘পয়লা আশ্বিন’ রচনাবলী-১৬শ (১৩৫০) : ১৪২-১৪৩
১১. ঐ ‘জন্মদিনে : ২১নম্বর কবিতা’, রচনাবলী-২৫ (১৩৫৫) : ৯২
১২. ঐ ‘বিশ্বশোক’, রচনাবলী-১৬শ (১৩৫০) : ৪৭-৪৮
১৩. ঐ ‘পত্রপুট : ১৫নং কবিতা’, রচনাবলী-২০শ (১৩৫২) : ৪২-৪৩
১৪. ঐ ধর্মমোহ’, রচনাবলী-১৫শ (১৩৫০) : ২৮৫
১৫. ঐ ‘প্রান্তিক : ১৭নং কবিতা’, রচনাবলী-২২শ (১৩৫৩) : ১৮-১৯
১৬. ঐ ‘জন্মদিন’ ঐ : ২৮
১৭. ঐ ‘পাবচন্ন’ ঐ : ৫৮
১৮. ঐ ‘নবজাতক’ রচনাবলী-২৪শ (১৩৫৪) : ৫
১৯. ঐ ‘রোমান্টিক’ ঐ : ৪৮
২০. ঐ ‘রোগশয্যায়-১১নং কবিতা’, রচনাবলী-২৫ (১৩৫৫) : ১৫
২১. ঐ ‘রোগশয্যায়-৫নং কবিতা’, ঐ : ৮-৯
২২. ঐ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ রচনাবলী-২৪শ (১৩৫৪) : ১০
২৩. ঐ ‘সাহিত্য বিচার’, রচনাবলী-২৭শ (১৩৭২) : ২৭৬
২৪. ঐ ‘বাঁকুড়ার জনসভায় অভিভাষণ’ ঐ : ৫৯৮
২৫. ঐ ‘জন্মদিনে : ১৬নং কবিতা’ রচনাবলী-২৫শ (১৩৫৫) : ৮৫-৮৬
২৬. ঐ ‘আহ্বান’ রচনাবলী-২৪শ (১৩৫৪) : ২৬

মানুষের স্বপক্ষে ঃ কালান্তরে

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রাজনীতি-সমাজনীতি-স্বাদেশিকতা-সম্প্রদায়সমস্যা আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্র করে রৈবিক-মানসিকতার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তার মূল প্রবাহ বিভিন্ন খণ্ড ধারার সংমিশ্রণে যে বিশিষ্ট মূল্যবোধের প্রতি অবিচল দিক্-নির্দেশ করেছে, তা হলো মানব-কল্যাণ ও মানুষের সর্বমাত্রিক বিজয়। যে কোন প্রকার অসাম্য, অত্যাচার, অবিচার দেশ-কাল পাত্র নির্বিশেষে কবিকে উদ্দীপ্ত করেছে ঐ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, ঘৃণা প্রকাশ করতে, কখনো বা সক্রিয় কর্মপন্থার সমর্থনে। তাই ব্যক্তিক পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে, রাষ্ট্রনৈতিক পর্যায়ে (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে) তিনি শ্রেণী-নির্বিশেষে মানুষের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন, মানবতার জয়গান গেয়েছেন। আপন যুক্তিতে যা ভালো বুঝেছেন তাকে অভিনন্দিত করেছেন, যা অকল্যাণকর মনে হয়েছে নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করেছেন। সক্রিয় রাজনীতিতে পুরোপুরি সম্পৃক্ত না হয়েও রাজনীতি-চর্চা থেকে নিজকে সরিয়ে রাখেননি, এমন কি দলগত প্রীতি-অপ্রীতির প্রশ্ন উপেক্ষা করে রাজনৈতিক সমস্যাবলীতে আপন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফলে অনেক সময়ই অপ্রিয় হয়েছেন রাজনৈতিক-নেতৃত্বের কাছে, কখনো বা রক্ষণশীল জনতার কাছে। হয়তো মার্কসবাদী অর্থনীতি-রাজনীতির গভীর তাত্ত্বিক পাঠে সম্বন্ধ না থাকায় নিজস্ব বিচার-পদ্ধতি ও অনুভবের মানদণ্ডে ফেলে সমাজনীতি-রাজনীতি-ধর্মনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাই বিষয়ান্তরে তাঁর সিদ্ধান্ত বা সমাধানগুলো একরৈখিক নয়, বহুতর কোণে ব্যাপ্ত, অর্থাৎ যে কোন একটি বিশেষ মতবাদের মাপকাঠিতে ফেলে তাঁর একাধিক সঠিক সিদ্ধান্তকে একই সমান্তরাল রেখায় বা একই তলে রেখে পরিচয় নেওয়া যায়না ; সেগুলোর সামগ্রিক ব্যাখ্যা বা যথার্থতা একমাত্র রৈবিক পদ্ধতিতে এবং রৈবিক মানদণ্ডের আলোকেই সম্ভব, অন্যকোন সূত্রে নয়।

রবীন্দ্র-মানসের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই জাতীয় ক্ষেত্রে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঠিক পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্তগুলোকে কেউ কেউ যেমন সমাজতান্ত্রিক চেতনার অভিক্ষেপরূপে অভিনন্দিত করেন, তেমনি কেউবা তাঁর দুর্বল দিকগুলো এবং তার পার্শ্ব-সিদ্ধান্ত বা অনুসিদ্ধান্ত গুলোকে প্রগতি-বিমুখ সিদ্ধান্তরূপে চিহ্নিত করে থাকেন। সামগ্রিকভাবে বিষয়গুলোকে উপরি-ধৃত কারণে এক কাঠামোতে ফেলে অর্থাৎ রৈবিক কাঠামোতে ফেলে বিচার না করার দরুণ এই দুই বিপরীত পথেই ভ্রান্তিযোগের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। আর এ কারণেই এ যাবৎ রবীন্দ্র-চেতনার মূল্যায়নে ও তার আদর্শ-ভিত্তিক চিহ্নিত-করণে এমন তুমুল বিতণ্ডার প্রকাশ, বিতর্কের ও উত্তাপের এমন প্রগলভ সমারোহ।

উল্লিখিত একই কারণে রবীন্দ্ররচনার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে এক হাতে যেমন তাঁকে প্রচণ্ড প্রগতিশীল বা সমাজতান্ত্রিক রূপে উপস্থাপিত করা যায়, তেমনি অন্যহাতে তাঁকে প্রগতি-বিমুখ, ভাববাদীরূপে চিহ্নিত করতেও কষ্ট পেতে হয়না (চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রগুপ্তের দল এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন?) কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রগতিশীল অভিব্যক্তির সঠিক মূল্যায়ন রৈবিক-চেতনার মূল প্রবাহের পরিচয় নেবার মাধ্যমেই সম্ভব, এবং তাতে করে রবীন্দ্ররচনায় অন্তর্নিহিত ও পরিস্ফুট স্ববিরোধিতার, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয় সংকটের যথাযথ তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। তাই আংশিক বিচার বা খণ্ডিত মূল্যায়নের ভ্রান্ত পথে অগ্রসর না হয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ভালোমন্দ, স্পষ্টতা অস্পষ্টতা, দুর্বলতা-বলিষ্ঠতা প্রভৃতি বিরোধী উপকরণের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথ-রূপে বিশ্লেষণের পথে এগুতে হবে—এবং তাতে কাল্পনিক বা আরোপিত গুণ বা দোষের সমন্বয়ে আকাঙ্ক্ষিত নতুন রবীন্দ্রনাথ তৈরির দায় থেকে আমরা নিশ্চিত অব্যাহতি পাবো।

এ পথে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রথমে আমরা রৈবিক আত্মসমালোচনায় পরিস্ফুট রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় নেবার চেষ্টা করতে পারি, যেখানে বিশেষভাবে জেগে উঠেছে রবীন্দ্র-চেতনার অন্তর্নিহিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়-সংকটের চিহ্নগুলো, এমন কি এদের উৎসমুখগুলো। এই বিশেষ দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়তায় প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটিতে (শেষ সপ্তক), যা বিশ্লেষণের বিশেষ কোন অপেক্ষা রাখেনা। কবি নিজেই জানাচ্ছেন কেমন করে জন্মদিনের বাসন্তী-রঙ প্রাচীরগুলো ভেঙ্গে পড়ার মধ্যদিয়ে পঁচিশে বৈশাখ এসে পেঁছিলো পাথর-বাঁধানো

পথে, কেমন করে প্রকৃতির রূপরস ও ঋতুরঙ্গের সৌন্দর্য-তৃষ্ণা পার হয়ে বাস্তব জীবনের দাবিতে চড়াই উৎরাই বেয়ে পৌঁছতে হলো 'তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্র-তীরে' ; নৈরাশ্য-অবসাদ-গ্লানি সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে হোল অভাবনীয় লক্ষ্যে :

"সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হলো ভেরী।

"পায়ে বিঁধেছে কাঁটা
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।"

এমনি ঘাত-প্রতিঘাত সঙ্কুল পথে কবির শিল্প-পরিক্রমা। স্বপ্ন-কল্পনা-লালিত বিশ্বাসের সাথে কঠোর বাস্তবের ও জীবনের দাবির সংঘাত তাঁর চলার পথকে করেছে বিসর্পিল, দুর্গম ও কণ্টকিত। তাই একটি সুস্পষ্ট রেখার মসৃণতায় চিহ্নিত নয় তার চলার পথ। আর এ বিষয়ে কবি সচেতন বলেই যেন আত্মসমালোচনার তথা আত্মবিশ্লেষণের গুণগ্রাম সঞ্চারিত হয় তাঁর বক্তব্যে :

"আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত
অনেক ছিন্নভিন্ন
অনেক উপেক্ষিত ?"

"সেই ভালো-মন্দ, স্পষ্ট-অস্পষ্ট, খ্যাত-অখ্যাত, ব্যর্থ-চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে"ই আমরা পেয়ে যাই বিতর্কিত রবীন্দ্রনাথের এক পূর্ণাবয়ব ছবি, যা শাদা-কালোর বৈপরীত্যে পরিস্ফুট। আর এই বিরোধী সংমিশ্রণে সৃষ্ট রবীন্দ্রনাথই বিনম্র বিনয়ে নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতা, সংশয় ও সীমাবদ্ধতার পরিচয় সবার সামনে তুলে ধরেছেন আপন শৈল্পিক সততার গুণগ্রামে। তিনি ভালোভাবেই জানেন, সামাজিক নিয়মের যে পরিবেশ তাঁকে পূর্বাপর লালন করেছে, সেখানে আকস্মিক আঘাতে সব পালটে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর সাধ ছিলো এমন একটি

'মাটির মমতা-মাখা ভুবন তৈরি করবার, যেখানে মৃতদিনের প্রেত বাসা বাঁধতে পারবেনা'। মাটির সঙ্গে থাকবে এর হৃদয়ের যোগসূত্র, যার মধ্যে 'রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ' শব্দিত হবার দুঃসাহস পাবে না। প্রতীকি অর্থে সেই মাটি-মাখা ঘরের ডাকে কবি ধরা দিতে পারলেন জীবনের শেষবেলায়, অর্থাৎ আমাদের হিসাবে কবি-জীবনের শেষদশকে। 'শেষ সপ্তক'-এর এই কবিতাটি (৪৪ নং) প্রতীকি-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, যদিও এখানে কবি-কণ্ঠ কখনো বিষণ্ণতায় নিষিক্ত, কখনো আপন অক্ষমতায় কুণ্ঠিত, কখনো বা সংক্ষুব্ধ বাসনার রক্তরাগে সমুজ্জ্বল। ১৯৩৫-সালের পঁচিশে বৈশাখে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির সর্বত্র সেই নব্য-চেতনার হীরক-দীপ্তি।

আত্মানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির কঠিন পথে কবি বরাবরই সবাইকে আহ্বান করেছেন ; আহ্বান করেছেন দেশবাসী সবাইকে। সেই উষর পথ ধরে আমরা দেখতে পাই যে, রাবীন্দ্রিক ভাবনা শুধু সাহিত্য-দর্শন-সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রাঙ্গণেই নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৃত্তের পরিসরেও প্রসারিত। এবং এসব ক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়ই নয়, হৃদয়ের সংবেদনশীলতায় তাঁর সমকালীন তুলনা বিরল। হৃদয়-মনের এই অতি-সংবেদ্যতার গুণগ্রামেই তিনি বহু বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক প্রশ্নে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন, যেতে পেরেছেন সমস্যাটির গভীর তলদেশে, এবং নিজেকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন শোষিত মানুষের স্বপক্ষে। সমকালীন স্রোতের বাইরে গিয়ে স্বাদেশিকতার কোন কোন প্রশ্নে তিনি অনেক সময় বিচক্ষণ, তাৎপর্যময় ও নির্ভুল সমাধানে আসতে পেরেছেন, যদিও আমরা জানি সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি নেমে পড়েননি। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেও কবি এমন এক অদ্ভুত বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সূত্র উপস্থাপিত করেছিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়বহ। তবু সমকালীন রক্ষণশীল জাতীয় নেতৃত্বের অনুমোদন বা সমর্থন আসেনি এই বিশেষ কক্ষে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও সামাজিক সংকীর্ণতার প্রতি রাবীন্দ্রিক-আঘাত প্রত্যাঘাত রূপে ফিরে এসেছে। স্বভাবতঃই সামাজিক বৃত্তে রক্ষণশীলতার পিছুটান সমকালীন পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার বাস্তবরূপ আমাদের স্মরণে এনে দেয়। আমরা তাই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পমনস্ক সত্তার পেছনে এই ব্যক্তিত্বশালী মনস্বীর সহজাতবোধ, সংবেদনা ও মননশীলতার এমন এক সমৃদ্ধ সংমিশ্রণ হয়তো ঘটেছিলো যার ফলে রাজনীতি-অর্থনীতিতে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে নিমজ্জিত না করেও অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্তের সূত্র টানতে পেরেছেন, কিংবা শিল্পকলার

সৃষ্টিতে বিচক্ষণ বাস্তবতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ভুল যা ঘটেছে তার কারণ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব এবং রাজনীতি-অর্থনীতির তত্ত্বগত চর্চার অভাব।

সামগ্রিক কাঠামোতে ফেলে কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের অনুসরণ বা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ আপন বিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রাধান্য দিয়েছেন বরাবর। এর ফলে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গুলোও রাজনৈতিক বিচারে কখনো কখনো সচেতন-স্তরে উন্নীত না হয়ে একক, বিচ্ছিন্ন অথচ অনন্য কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, এবং সাধারণের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়নি। তাই বেশ কিছু প্রগতিশীল ও বলিষ্ঠ কর্মসূচী রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে অবহেলিত হয়ে রবীন্দ্ররচনার পাতায় সীমাবদ্ধ রইলো, এদের উজ্জ্বল দীপ্তি জনচেতনা উদ্দীপ্ত করার কাজে সার্থক হয়ে উঠলোনা। এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষ্যণীয় যে রবীন্দ্র-মানসের উল্লিখিত রাজনৈতিক পথ-চলার ক্ষেত্রে যে কয়েকটি উপকরণ কার্যকারণবিধায় যুক্ত হয়ে তাঁর পথসৃষ্টি করেছে, তা হলো রাবীন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার আলোকে প্রতিফলিত 'মানব-সম্বন্ধ, মানব-প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণ'। এই তিনটি মুখ্য উপকরণের প্রভাব ও তাদের কার্যকারণ-সম্বন্ধের গভীর বিশ্লেষণে রবীন্দ্রমানসের সমগ্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনীতিসম্পৃক্ত শিল্পকলার স্বরূপ ও সদর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে কেমন করে মানব-স্বার্থ ও মানব-কল্যাণ তাঁকে প্রবল চৌম্বক আকর্ষণে টেনে এনে মানবতাবাদী, শান্তিবাদী, গণতন্ত্রকামী, ধনবৈষম্য-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছিলো। ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, তীব্র স্বাদেশিকতায় সংশ্লিষ্ট হয়েও কেন তিনি বেশীদিন জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ-বৃত্তে অবস্থান করতে পারেননি; অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক চেতনার প্রশস্ত অঙ্গনে বসবাস করেও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে স্বচক্ষে দেখা ও তার স্বপক্ষে প্রবল সমর্থন জোগানোর পরও কেন সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। শক্তি প্রয়োগ, তা যে পক্ষ থেকেই হউকনা কেন তাঁর কাছে স্থায়ী সমাধানের নির্ভুল পন্থারূপে স্বীকৃত হয়নি। তাঁর বিভিন্নমুখী চেতনায় 'মানুষ' শব্দটি পূর্বাপর এক প্রবল অভিক্ষেপরূপে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, অংশত আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো তাঁর চৈতন্য।

এই মানুষের জয়গান কবি জীবনভরই করেছেন। বিশ্বাস ভঙ্গের তীব্র বেদনা ও হতাশার মধ্যেও জীবনের শেষ পয়লা বৈশাখে যে প্রত্যাশা নিয়ে

মানুষের জয় ও নবজীবনের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, গুণগত বিচারে তার রূপ অনন্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ; এই চেতনারই অভিব্যক্তি দেখা গেছে বেশ কয়েক বছর পূর্বেকার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে (শ্রাবণ, ১৩৩৮) :

> "কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে—
> জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।" (শিশুতীর্থ)

এ যেন সবাই মিলে শপথ-বাক্য উচ্চারণ, নতুন পৃথিবী গড়ার সজীব প্রত্যাশায় ভাস্বর হয়ে। মা তৃণশয্যায় উপবিষ্ট, কোলে তার শিশু ; সম্মিলিত জনতার অই জয়ধ্বনিতে যেন ফুটে উঠল গোর্কির 'নবজাতক' গল্পের শেষ ছবিটি। লক্ষণীয় যে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থটি কী বিষয়ে কী প্রকরণে রাবীন্দ্রিক পার্শ্বপরিবর্তনের এক সমৃদ্ধ দলিল, যা গুণগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত।

এই নিটোল-চেতনার আদর্শ মানুষ রবীন্দ্র-মানসের পূর্বাপর অন্বিষ্ট। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কবি যখন ইউরোপে যান, তখন তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ কবির প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি।" এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে কবি 'য়ুরোপের মানুষ' বলেননি। ঠিক দুই দশক পর পারশ্য-ভ্রমণের সময় ঠিক একই প্রশ্নের জবাবে কবি বলেছিলেন যে তিনি সেখানে পারশিক অর্থাৎ 'পারশ্যের মানুষ' দেখতে এসেছেন। (এক্ষেত্রে 'পারশ্যের মানুষ' বলার মাধ্যমে এশিয়ার প্রতি কি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন ?)। সে যাই হোক, অন্বিষ্ট মহামানবের প্রতীক এই 'মানুষ'কেই কবি দেখতে চেয়েছেন ; এবং দেখেছেন নানারূপে, নানারঙে। দেখে দেখে এই অতিসাধারণ মানুষের জন্য তাঁর চোখে জমেছে অসাধারণ কান্না, কখনো গর্ব, কখনো বা হাসি। এই মানুষের স্বপক্ষে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই তাঁকে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষ সমর্থন করতে হয়েছে। ভাঙ্গতে হয়েছে এককালীন বিশ্বাস। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে আজন্ম-লালিত বিশ্বাসের সাথে নিরন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কতদূরই বা যাওয়া চলে। বলাবাহুল্য, এই অন্তর্লীন রক্তঝরা দ্বন্দ্বই সমস্যার অনুধাবন সত্ত্বেও সংগ্রামী-ভূমিকায় দৃষ্ট তাঁর সীমাবদ্ধতার কারণ। এ কারণেই একদিকে নির্মম বাস্তবকে স্বীকার করেও অন্যদিকে স্বকীয় পথে চলার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ধরতে হয়েছে মধ্য-পথের নিশানা।

প্রকৃতপক্ষে মানব-মহিমা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধরে রাখতে গিয়ে তাঁকে 'মহামানবের অভ্যুদয়ের' প্রত্যাশা শেষ সম্বল হিসাবে ধরে থাকতে হয়েছিলো। বিশ্বভারতীতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সেই মহামানবের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন আসন, যদিও স্বাভাবিক নিয়মেই এর সর্বশেষ পরিণতি ইউটোপিয়ান। এই মানব-মহিমার রূপ সমুজ্জ্বল করে তুলতে, তাকে উচ্চে তুলে ধরতে গিয়ে একাধিক বিষয়ে হয়েছিল তার মোহভঙ্গ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি চূড়ান্ত অবিশ্বাস ও ঘৃণা তার মধ্যে অন্যতম। জাতীয়তাবাদ তেমনি আরেকটি বিষয়, যার উগ্র ফ্যাসিবাদী রূপ কবিকে করে তুলেছিলো বিপর্যস্ত। তবু মানুষের এবং মানব-মহিমার সর্বশেষ বিজয়ে কবির বিশ্বাস ছিলো সুনিশ্চিত :

> "একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" (সভ্যতার সংকট)

এই বলিষ্ঠ বিশ্বাস রবীন্দ্র-মানসের সৃষ্টিশীলতার একটি স্থায়ী গুণগত উপকরণ, যার পরিব্যক্ত এবং পরিস্রুত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের একটি বিপুল অংশে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন রঙে, বিভিন্ন রেখায়।

এ পর্যন্ত আলোচিত বিভিন্ন প্রসঙ্গে রৈবিক সৃষ্টির ইতিবাচক সমৃদ্ধ দিকগুলোই তুলে ধরা হয়েছে ; এগুলোর পরিমাণ যেমন অল্প নয়, তেমনি গুণগত দিক থেকেও এদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গতভাবেই কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে কবির সেইসব রচনার কি হবে যেগুলোতে ভক্তিবাদ কিংবা সৌন্দর্যতত্ত্ব কিংবা অতীন্দ্রিয় মানসিকতার ছায়া পড়েছে ? সেসব কি মূল্যায়নের বাইরে থেকে যাবে ? আমরা বলি : রবীন্দ্ররচনায় ভক্তিগীতি আর সুন্দরের ধ্যান, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, প্রেম ও ঋতুরঙ্গের বৈচিত্র্য নিয়ে যে বিপুল সৃষ্টি সম্ভার তাকে অস্বীকারের কোন প্রশ্নই আসেনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যই বা ভুলি কেমন করে যে এসব রচনায় এমন বহু কিছু আছে, বিশেষ করে তার গানে, এবং নিসর্গ ও তার পারিপার্শ্বিকতা ঘিরে, যেগুলোকে জীবন-যাপনের প্রয়োজনে বা প্রাত্যহিক তার টানে কিংবা মানব-চৈতন্যের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল বলা চলেনা। রুক্ষ, তিক্ত জীবন-যাপনের প্রেক্ষিতে কিংবা সংগ্রামী পরিবেশের প্রয়োজনে এদের তাৎক্ষণিক কার্যকরী ভূমিকা না থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা, বিন্যাস ও পরিবেশ পরিবর্তনের পর এদের কোন কোন অংশ, বিশেষতঃ

ঋতু, নিসর্গ ও অনুরূপ বিষয়ক রচনাবলী যে উপভোগ্যতায় ফিরে আসবে না, এমন কথা কি কেউ জোর করে বলতে পারবেন ? তবু আমরা বলবো, রবীন্দ্র-রচনার যেসব অংশ আমাদের জীবন-যাপনে এবং সমকালের প্রয়োজনে কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হবে, তারা স্বাভাবিক নিয়মেই এক পাশে পড়ে থাকবে কিংবা অবহেলায় ধূলি-ধূসর হতে থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ একটি তুলনা মনে আসছে, পুরোপুরি প্রযোজ্য না হলেও একেবারে অবান্তর নয় নিশ্চয়ই। এ যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিপ্লবী কবি নেরুদা'র প্রেমের এবং বিশুদ্ধ অনুভবের কবিতাবলী কি প্রতিক্রিয়াশীলতার খুঁটি হিসাবে নিন্দিত ? আর যে-কবির জন্মস্থান ভারতীয় উপনিবেশ, যার প্রাথমিক পর্যায়ের রচনাবলীর কাল ঊনিশ শতকের শেষ-পাদ এবং বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক,—যখন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ অত্যন্ত নৈরাজ্যিক ও প্রাথমিক স্তরে এবং তা বিভিন্ন স্ববিরোধী দুর্বলতায় ও জটিলতায় বিমিশ্র ; সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও যখন পশ্চাদ টান একটি প্রধান প্রবাহে প্রতিফলিত এবং সেকালে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক জাতীয়-চেহারার প্রধান অংশে স্রষ্টা বলতে হেম-নবীন-রঙ্গলাল-বংকিম,—তখনকার সেই পরিবেশ-বাস্তবতা বিচার না করে আমরা কি তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে আশা করবো শ্রেণী-বাস্তবতার কঠোর ঝলসানি ? কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা দেখেছি তরুণ কবির রচনায় সমকালীন বাঁধা-ধরা সড়ক থেকে বেরিয়ে এসে যৌবনের বাধাবন্ধহীন আত্ম-প্রকাশের ঝলসানি ও স্বাতন্ত্র্য ; জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, মানবিক-চেতনার অভ্যুদয়, স্বাদেশিক চেতনার সুতীব্র প্রকাশ এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতা, অন্ধতা ও রক্ষণশীলতার (সামাজিক ও রাজনৈতিক) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই চেতনা আরো রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে ব্যাপ্ত গভীরতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। "সম্মুখের বাণী" তাঁকে বরাবরই টেনে নিয়েছে, ডাক দিয়েছে বারবার এগিয়ে চলার পথে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্র সাহিত্য যেমন বিপুল ও বিচিত্র, তেমনি বহুমুখী তার পদচারণা। গানে, নাটকে, কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে, চিঠিপত্রে, ভ্রমণ কাহিনী কি স্মৃতিচারণে অথবা প্রবন্ধাবলীতে রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি নিঃসংশয়ে রাজপথের মহিমা অর্জন করেছে। কাজেই তার যথাযথ মূল্যায়নে কিছু কবিতা, প্রবন্ধ বা বক্তব্যের কালজয়ী ভাস্বরতা যেমন বিচার্য, তেমনি এ সত্যও বিচার্য যে বাঙালীর জীবনপরিক্রমায় তার প্রকৃতিগত রসাবেশে, ঋতু-নিসর্গের বৈচিত্র্যময় আস্বাদে, কিংবা স্পর্ধিত অত্যাচারের

বিরুদ্ধে আত্মশক্তির প্রতিরোধী উদ্বোধনে রৈবিক সৃষ্টির ভূমিকা বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি বৃত্ত থেকে অপসৃত হবার সুযোগ আদৌ আছে কিনা। সুতীক্ষ্ণ মননশীলতায় কিংবা জীবনের নিভৃত আবেগে ও মধুর আবেশে অথবা প্রতিবাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণে রাবীন্দ্রিক শষ্যাবলী কি আমাদের নিয়তই সুঠাম আত্মপ্রকাশে এবং পরিশীলিত উৎকর্ষে পৌঁছাতে সাহায্য করেনা ? ক্রোধে-ঘৃণায়, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-আবেগে ও হাসি-কান্নায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ও কবিতায় বাঙালীর মনোগহনের অধিবাসী এবং তা প্রাত্যাহিকতায় আক্রান্ত। ক্রুদ্ধ, বিপর্যস্ত ও যন্ত্রণা-তিক্ত এ-যুগে কোকিলের দিকে কান ফেরাবার সময় নেই ঠিকই, কিন্তু মানুষ কি সারাক্ষণই সংগ্রামে লিপ্ত থাকে ? তার কি প্রয়োজন নেই কিছুটা অবসরের, কিছুটা অবকাশের যাতে সে আবার নতুন করে সংগ্রামী-চেতনায় শাণিত হয়ে উঠতে পারে ? এই প্রতিটি পর্যায়ে রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে যদি আমরা কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করতে পারি, তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রগতিশীল মহলে ক্ষুব্ধ বিতর্কের একটি অন্যতম প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে 'বিশুদ্ধ শিল্পকলার সমর্থকদের আচরণ ; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ভক্তিবাদের বেদীতে স্থাপন, তাঁর ভক্তিবাদী-সৌন্দর্যবাদী-বিশুদ্ধচেতনার রচনাবলীর উদ্দেশ্যমূলক অতি-প্রচার, যাতে এযুগের পাঠক তাঁকে রোমান্টিক ও অতীন্দ্রিয়বাদী সৌন্দর্যপিপাসু শিল্পী রূপেই চিনতে পারে, যাতে রবীন্দ্র-মানসের প্রগতিবাদী ভূমিকা, ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ধনতন্ত্রবিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা ভাববাদের চোরাবালিতে চাপা পড়ে যায় ; যাতে রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিমিশ্ররূপ, তার বৈচিত্র্যময়তা সাধারণ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে না পারে। অংশতঃ বাংলাদেশে এবং প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে পঁচিশে বৈশাখ ও বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে রবীন্দ্র-পূজার যে সঘন-ঘটা লক্ষ্য করা যায়, তাতে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রগতিশীল দিক উন্মোচনের কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায়না। অতি-ভক্তির আড়ালে নান্দনিক ও রক্ষণশীল মহল কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে পাকাপাকিভাবে সমাধিস্থ করবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। কিন্তু এইসব ললিত গলিত স্তব ও আরাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায়ই হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের রথ সে সাবধান বাণীতে নিশ্চল হবার নয়।

আজ তাই রাবীন্দ্রিক সৃষ্টির সামগ্রিক চরিত্র এবং তার ঐতিহ্যগত ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজন বড় বেশী। বর্তমান আলোচনার

একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রমানসের বিচক্ষণতা ও প্রগতিশীলতা কী সংযত দৃঢ়তায় বা কী তিক্ত বলিষ্ঠতায় রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি মস্তবড় অংশে পরিব্যাপ্ত, সেই বাস্তব সত্য পাঠকের সামনে তুলে ধরা। বাংলাদেশের পাঠকের একটি বৃহৎ অংশ বরাবর জেনে আসছেন যে, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বিলাসী কবি, ভক্তিবাদী গীতিকার। কিন্তু এই পরিচয়ের বাইরে যে-রবীন্দ্রনাথের অধিবাস, রবীন্দ্রচর্চার মাধ্যমে সেই বলিষ্ঠ, রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। দেখা যায়, শেষবয়সে কবি-সাহিত্যিক শরীর-ধর্মের প্রভাবে আকাশচারী হয়ে ওঠেন, মৃত্যুচেতনার আচ্ছন্ন প্রভাবে মনের দাপট যায় কমে, চেতনায় জমা হতে থাকে ভক্তিবাদের পলি (পশ্চিমবঙ্গে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে)। কিন্তু রবীন্দ্র-চেতনা এর আংশিক ব্যতিক্রম। তাঁর প্রথম বয়সের সৃষ্টির তুলনায় শেষ বয়সের লেখাতেই গুণগত বিচারে ইতিবাচক মূল্যবোধ (বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। তাছাড়াও শেষ কয়েক বছরের গদ্যধর্মী বয়নমূলক বা চিত্রময় রচনায় চোখে পড়ে গ্রাম, মাঠ, ঘাট, গাছপালা, খেয়াঘাট, পশু পাখী, শ্রমজীবী মানুষ এবং জীবনযাত্রার আটপৌরে খন্ড খন্ড ছবির মিছিল—সব মিলিয়ে জীবনযাপনের তিক্ত, বিষণ্ণ, ছেঁড়াখোড়া ছবি, যেন চিত্রকরের জলরঙের তুলিতে আঁকা।

প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের অতি-সংক্ষিপ্ত ঐতিহ্য-পরিচয়ের রূপবিচারে আমাদের চোখে পড়ে যে, শুধু শেষ দশকেই নয়, প্রথমাবধি প্রতিটি পর্বেই কোন-না-কোন বিষয়ে সেকালের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-রচনা—কবিতায় বা গল্পে, উপন্যাসে বা প্রবন্ধে প্রগতিধারায় চিহ্নিত। পর্বান্তরের কবি তাই কালান্তরের কবিরূপে রোমান্টিকতার বিপ্রতীপ বিন্দুতে প্রতিবাদী চেতনার প্রবক্তা। তাঁর ভালোবাসার হাত প্রসারিত হয় কঠিন মাটির বাস্তবতার প্রতি ; কারণ মাটির বাস্তবতা বঞ্চনা জানেনা। কবির এই চৈতন্য বাস্তবতার মাটিতে শিকড় চালাতে পেরেছিলো বলেই তাঁর স্বাদেশিক চেতনার (সামাজিক রক্ষণশীলতা ও বিদেশী উপনিবেশিকতায় বিরুদ্ধে) উত্তর-প্রকাশ ঘটে বিদ্রোহী নজরুলের স্বদেশ-চেতনায়, বলা বাহুল্য অধিকতর আবেগের ব্যাপ্তিতে ও তীব্রতায়। নজরুলীয়ানার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই এই ঐতিহ্যের প্রকাশ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় চেতনায়, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিকতার পদক্ষেপে এবং ভাঙ্গনের রুদ্র হুংকারে ব্যাপ্ত। এরই শ্রেণীচৈতন্যের প্রতিফলন সুভাষ-সুকান্তর শ্রেণী-সংগ্রামের উদাত্ত ঘোষণায়, যা যুগ-সংকট এবং যুগের দায় মোচনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এই একই সঙ্গে ক্রম-

পরিণতির পথ ধরে শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দীপ্ত। রৈবিক ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারে সংশয়ের প্রশ্ন নেই জেনেই শ্রেণী-সংগ্রামের কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেছেন নতুন-রূপে, যিনি জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সহিষ্ণু যাত্রাপথ সৃষ্টি করে চলবেন।

অন্যত্র আমরা উল্লেখ করেছি যে, রৈবিক বিষয়-মাহাত্ম্য ও প্রকরণিক পূর্বাভাস বিষ্ণু দে'র পরিশীলিত দক্ষতায় গভীরতর ব্যঞ্জনা ও সুঠাম অবয়ব লাভ করেছে। বিশদ বিশ্লেষণে পরিস্ফুট হবে যে বিষ্ণু দে'র শ্রেণী-চেতনার রোমান্টিক স্ফূর্তি উল্লিখিত রৈবিক চৈতন্যের পরিব্যাপ্ত ও অগ্রসরতর রূপ। তিরিশের এই শক্তিমান কবি শুধুমাত্র 'রাজার ছেলে' বা 'রাজার মেয়ে'র রাবীন্দ্রিক রূপক আধুনিক শহরের ক্ষুধিত জীবন-যাপনে স্থাপন করে, কিংবা কথকতার সচ্ছল বয়নের মধ্য দিয়ে রাবীন্দ্রিক কাহিনীর রূপকল্পে বা প্রতীকে রৈবিক চেতনার পরিস্রুত ও আধুনিকতর মুক্তি ঘটিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি ; আলংকারিক আধুনিকতার রাবীন্দ্রিক প্রয়াস এবং পদক্ষেপকে তিনি কোমল গান্ধারের ললিত বাস্তবতায় প্রকাশ করেছেন এমনি সচেতনতায় যে সেই ঐতিহ্যাধিকার যেন "বজ্রে বাজালে গান্ধারে বাঁধা বীণা" এবং এর উপর ভর করেই কবি "জীর্ণ জীবনে স্বপ্নের ঋজু আল্পনা" আঁকেন, যা সোনায় রাঙানো রূপনারানের প্রান্তে কাঁড়তে কোমলে ভাস্বর হয়ে উঠে। এই প্রাক্-চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেই বিষ্ণু দে রাবীন্দ্রিক ফলন্ত সত্তাকে মাটির চৈতন্যে যেন আকাশের ঋণের মতো গ্রহণ করে তাকে ফুলে ফলে দীপ্ত দান্ত করে তুলতে চেয়েছেন এবং অনায়াস-দক্ষতায় রাবীন্দ্রিক ভুবনডাঙ্গাকে মহিম-রহিমের হাসিকান্নায় চিহ্নিত তুলসী-ডাঙ্গার সচেতন প্রতিরোধী ভূমিতে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন, এবং 'রাজনীতিতেই জীবনের নিশ্চিত গতি' এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসে অঙ্গীকৃত হয়ে অনুভব করেছেন যে 'সংগ্রাম শান্তির এক সুস্পষ্ট উপন্যাস'। তাই পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণের উত্তরাধিকার ভেঙ্গে ভেঙ্গে, রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, বরং জঙ্গম সূর্যকে জীবনের জঙ্গী প্রতিদিনে বেঁধে নেবার প্রয়াস পান, এবং 'নেকড়ের হন্যেয় ছিন্নভিন্ন দেশে' দুর্জয় মানুষের সংগ্রামী ভূমিকার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটান সুদক্ষ হাতে। বিশদ ও সতর্ক পাঠে বুঝতে কষ্ট হয়না যে বিষ্ণু দে'র পরিণত-চৈতন্যের কাব্যচর্চায় রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের এক পরিশীলিত ও সচেতন কাব্যরূপের আভাস পাওয়া যায় এবং সেটা কবি খুব সচেতন-দক্ষতায় সমাপন করেছেন বলেই তাঁর মধ্য ও অবশেষ পর্বের সর্বত্র এই প্রখর মাধুর্য পরিলক্ষিত। প্রকৃত-

পক্ষে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের সচেতন-সংগ্রামী ধারার বিশদ বিশ্লেষণে বিষয় ও প্রকরণগত রৈবিক ঐতিহ্যের আরো কিছু সচেতন ভাষ্য অন্যত্র দেখতে পাওয়া যাবে।

এমন কি, সচেতন-বৃত্তের বাইরেও, রবীন্দ্রোত্তর পর্বের একজন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যবাদী কবির রচনায় দেখা যাবে উক্ত ঐতিহ্যাশ্রয়ী রেখাঙ্কন। বিশেষ করে রৈবিক চেতনাধৃত আত্মশক্তির কিংবা স্বাতন্ত্র্যবোধের সংহত প্রকাশ এবং প্রেমের বিচিত্র জটিল অভিব্যক্তির মৌল প্রভাব যেন এই নান্দনিক কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনায় সুপরিস্ফুট। তাই ১৯৩৮ সালে তিনি যখন লেখেন

“শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে
ফুৎকারে পবন, কাশের লহরী দুলকে,
বসেছি বিজনে নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণ দলে।” (‘নান্দীমুখ’ : সংবর্ত)

তখন একটি পরিপূর্ণ রাবীন্দ্রিক স্তবক যেন আমাদের শ্রুতিতে ঝংকৃত হয়ে ওঠে। কিংবা যখন বলেন :

“স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন,
অথচ তাদের চিনি।”... (‘নান্দীমুখ’)

অথবা ঘোষণা করেন যে, “স্বীয় শক্তিতে যোগ দিতে হবে শুদ্ধির তাণ্ডবে” তখন রৈবিক প্রকাশের ভাবদ্যোতনা যেন আমাদের কানে বিষয়ে-আঙ্গিকে ধ্বনিত হতে থাকে। তেমনি রৈবিক ভাবচেতনা প্রখর হয়ে ফুটে উঠে যখন কবি নিশ্চিত ঘোষণায় বলেন :

“তবু বিশ্ব-মানবেরে একমাত্র সত্য বলে জানি ;
সভ্যতার রক্তলিপ্সা হয়ে গেছে আজ কানাকানি ;...

“তাই মানুষের দিকে বারংবার মেলে দিই হাত ;” ইত্যাদি।
(‘প্রতীক’-ক্রন্দসী)

এ-যেন রৈবিক চৈতন্যের প্রতিধ্বনি। এতদসত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করি, প্রকরণিক প্রয়োগে অতিসচেতন এই কবি “মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই

আমার অন্বিষ্ট ; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ"—ইত্যাদি ঘোষণার পরও বিশ্বজুড়ে সংবর্তের কালো মেঘ লক্ষ্য করে পরম অসহায়ের মতো না বলে পারেন না (১৯৩৯) যে "নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু" বা অনুরূপ বাক্যাবলী ("এ-যুগের চাঁদ কাস্তে" কিংবা "তীর্থরজে রক্তের অঞ্জলী।" ইত্যাদি)। আর প্রসঙ্গতঃ আমাদের বিস্ময় আবর্তিত হয় একারণে যে, মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একই সময়ে জরাহত রাবীন্দ্রিক চেতনায় বিশ্বসমস্যা যখন সমাজব্যবস্থার সচেতনতায় বিধৃত ("ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে/ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন/সভ্য-নামিক পাতালে যেথায় জমেছে লুটের ধন" : প্রায়শ্চিত্ত), তখন এই উত্তরসূরী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নাস্তি-চেতনায় ভর করে 'আমগ্ন তরণীতে উপবিষ্ট, তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকার' ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত ; বলা বাহুল্য কলাকৈবল্যবাদের এই পরিণাম বিশেব বহুল-দৃষ্ট এবং এই পরিণতি ইতিহাস-সিদ্ধ ও সমাজবিজ্ঞান-নির্ভর।

কবিতার ব্যাপক প্রেক্ষিত ছাড়াও শেষ পর্বের গদ্যরচনায় (চতুরঙ্গ, তিনসঙ্গী প্রভৃতি) যে ঝকমকে ঋজুতার সুঠাম প্রকাশ-শৈলী আমাদের মুগ্ধ করে, তার ঐতিহ্যগত প্রভাব তৎকালীন রবীন্দ্রোত্তর গদ্যরীতির প্রকাশকে যে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে, বিশদ বিশ্লেষণে তা পরিস্ফুট হবে। আজ নতুন যুগের ভোরেও শিল্পসাহিত্যে যেখানে মৃত্যুচেতনার প্রবল বিস্তার, নেতির নৈরাজ্য এবং যৌন-উত্তেজনার প্রবল আর্তি, সেখানে পূর্বাধিকারের তথা ঐতিহ্যের প্রশ্নে চাই সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-বিরোধী শান্তিচেতনার বলিষ্ঠ সমর্থক রৈবিক শৌর্যের ঝলসানি, যা নজরুল-সুকান্তর সংগ্রামী ভাষ্যে বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রশস্ত পথ রচনা করেছে একালের সচেতন শিল্পীদের জন্য। তাই ভুলে যেন না যাই যে শ্রেণী-বিভক্তির পাপাচারে পিষ্ট সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে অন্ত্যজ মানুষের সাথে একাত্মতার বাসনায় রৈবিক-চেতনার নিঃসংশয়, উদাত্ত ঘোষণা : "আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা, আমি পংক্তি হারা," বলা বাহুল্য, যেখানে পৌঁছাতে পারেন না প্রগতি-বিরোধী শিবিরের শিল্পী, যিনি পারবেন না শ্রেণীচ্যুত পরিচয়ের বলিষ্ঠ ঘোষণায় নিজকে তুলে ধরতে, যে-ঘোষণা শপথের গুণ-গরিমায় ভাস্বর। এই সুঠাম স্পর্ধিত চেতনার পরিস্রুত ও পরিব্যক্ত রূপ দেখতে পাই পরবর্তী সাহিত্যে নজরুলের আকাশ-বিদারী মুক্তি-চেতনার বজ্রকণ্ঠে এবং সুকান্তর শ্রেণী-চেতনার সংগ্রামী ভাষ্যে, এবং এই ধারা-স্রোতে সংযুক্ত আরো অনেকের কবিকণ্ঠ।

তাই বিশুদ্ধ সাহিত্য-তত্ত্বের ফাঁপা আদর্শ-সমর্থকদের আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথকে সবলে বা কৌশলে ভাববাদের অতল আবর্তে টেনে নেয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে কবি মানুষের স্বপক্ষে সারাজীবন সোচ্চার ছিলেন, রাশি রাশি রচনায় যে প্রমাণ বিধৃত রয়েছে, যিনি জীর্ণ শরীরের দুর্বলতা জয় করে গর্জে উঠতে পারেন এই বলে যে :

> "I have said it over and again that the aggressive spirit of Nationalism and Imperialism, religiously cultivated by most of the nations of the West, is a menace to the whole World."
>
> (Manchester Guardian, August, 5, 1926)

তাঁকে রক্ষণশীলতার দক্ষিণী শিবিরে টেনে নামানোর চেষ্টা হাস্যকর। জীবন থেকে সরে মৃত্যুচেতনায় সমাহিত হওয়া নয়, বরং জীবনমুখীনতাই রবীন্দ্র-মানসের চিরদিনকার অন্বিষ্ট। প্রশান্ত মহলানবীশের জবানিতে জানা যায়, মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিস্টদের ষ্টালিনগ্রাড থেকে ক্রমশঃ পিছু হটার সংবাদে গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নাকি বলেছিলেন যে, রুশিয়ার বিজয় সুনিশ্চিত। তখন কি কবির আধো-চেতনায় তিরিশে-দেখা সৃষ্টিসুখে মহীয়ান রাশিয়ার সুখস্মৃতি নিবিড় ছায়ার মতো দুলছিলো ? আমরা জানি না সে তথ্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের অন্যতম অগ্রসর-চিন্তার মানুষ। আজ নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলে এই জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষি তাঁর নিজস্ব আলোক-বৃত্তে প্রগতি-চিন্তার প্রতীক রূপে বিবেচিত হবেন। বাঙালীর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের অনুভূতি থেকে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ঝেড়ে ফেলা, আজকে দূরে থাক, আগামী কালেও সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয়ের পর্যাপ্ত কারণ বর্তমান। রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে শুধু একটি সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য বা সম্পদই নয়, এর একটি বিশেষ অংশ এ-কালের জন্যও গতিশীল সৃষ্টি। সুখে-দুঃখে, সংগ্রামে-বিপর্যয়ে অর্থাৎ জীবন-যাপনের বিসর্পিল যাত্রাপথের অমোঘ বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র-রচনা থেকে আমাদের প্রয়োজন যতটুকু গ্রহণ করতে পারবে, তাতেই বার বার প্রমাণিত হবে রাবীন্দ্রিক শিল্পসৃষ্টির প্রয়োগ-নির্ভর শাশ্বত গরিমা, যা নিঃসন্দেহে সময়কে জয় করবার শক্তিতে গুণ-সমৃদ্ধ।